যুগমানব লোকনাথ

নরেশচন্দ্র রায়

বুক হোম

৩২ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশকের কথা

দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে শ্রীনরেশচন্দ্র রায় প্রণীত 'যুগমানব লোকনাথ' পুনর্মুদ্রিত হল। ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবাজী যুগপুরুষ। তাঁর সাধনজীবনের ব্যাপ্তি তুলনারহিত। যদিও প্রচারবিমুখ সন্ন্যাসী বলে তিনি অন্যান্য সাধকদের মতো সর্বালোচিত নন।

বিস্তৃত পরিসর আয়ুর বেশির ভাগ সময়ই তিনি নির্জনে অগোচরে সাধনা করেছেন। তার কোনো পুরোপুরি লিপিবদ্ধ ইতিহাস নেই। সাধনায় সর্বোচ্চ স্তরে সিদ্ধিলাভ করে তিনি হয়েছিলেন সিদ্ধবাক। অপরিসীম ইচ্ছাশক্তি আর অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা জীবনের শেষ কিছু বছরে তিনি পূর্ব বাংলার মানুষকে করেছেন বিস্মিত। এই সময়ে মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি বারদী-তে আশ্রম স্থাপন করে বসবাস করেছেন। তাঁর বিরাট আর ব্যাপক জীবনের ছায়ামাত্র নিয়ে নরেশচন্দ্র রায় এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ভক্তসমাজেও গ্রন্থটি আদৃত হয়েছিল প্রচণ্ড সমাদরে, উৎসাহে। আজও তাঁর অগণিত ভক্ত জানতে চান এই পুরুষের জীবনকাহিনী সম্বন্ধে। তাদের জন্যই গ্রন্থটি আমরা পুনঃপ্রকাশ করলাম পরিবর্ধিত আকারে। আশা রাখি গ্রন্থটি পূর্বেকার মতোই ভক্তজনগণের মধ্যে সমাদৃত হবে ও ব্রহ্মচারী লোকনাথজীর জীবনকে নতুন ভাবে প্রচারিত করে তুলবে ঘরে ঘরে।

কৈফিয়ৎ

অতি শৈশবে আমার মনে লোকনাথ ব্রহ্মচারী সম্পর্কে কৌতূহল যিনি প্রথম উদ্রেক করেন তিনি আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব। গৃহে ছিল শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। তাঁর পাদপীঠে প্রতি বৎসর মহোৎসব উপলক্ষে ভক্ত সমাগমে ধর্ম ও মহাপুরুষদের সম্পর্কে বহু আলোচনা হত। তার পরিণতি শিশুমনে রেখাপাত করেছে—জাগিয়েছে মহাপুরুষদের জীবনী জানবার অদম্য আকাঙ্খা।

এ ছাড়া আমার মাতামহ ৺ভগবানচন্দ্র দাশ ছিলেন একজন সাধক। শুনেছি স্বপ্নে তোতাপুরি থেকে মন্ত্র পেয়ে তিনি সাধনপথে অগ্রসর হন। সূক্ষ্মদেহে ব্রহ্মচারী লোকনাথ এসে আসন প্রাণায়ামাদি হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন। এসব কথা আমি শুনেছি কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নেই। তাই পুস্তকে কোন উল্লেখ করিনি। দাদা মহাশয়ের অনেক শিষ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চারণ কবি মুকুন্দ দাশ অন্যতম। দাদামহাশয় দেহত্যাগ করেন একশ দশ বৎসর বয়সে। তাঁর জীবনের অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনেছি তাঁর শিষ্যদের মুখে। দাদামহাশয়ের চেহারার সঙ্গে লোকনাথ বাবার যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। তাই আমার অবচেতন মনে ব্রহ্মচারী বাবার প্রতি ভক্তিপ্রবণতা ছিল।

যুগধর্মের ঝঞ্ঝাবাত্যায় মনের ভিতর উঠেছে বিশ্বাস অবিশ্বাসের তরঙ্গ—প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে সংশয়। দ্বন্দ্ব-বিক্ষিপ্ত মনের এই অবস্থায় যিনি আমার ভিতর সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়ে জাগিয়ে তুললেন আমার সুপ্ত বিশ্বাস, তাঁর আপত্তি হেতু নামটা প্রকাশ করতে পারলুম না—তিনি রইলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু আমার স্মৃতির মণিকোঠায় চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ। তাঁরই চেষ্টায় লোকনাথের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করলাম—পেলাম প্রত্যক্ষ ফল। সে এক কাহিনী।

নূতন করে পেলাম প্রেরণা। এই জীবনী লেখার মত সামান্য সঞ্চয়ও আমার তহবিলে ছিল না। শ্রীশ্রীলোকনাথ মাহাত্ম্য পড়ে আমার ভিতরে এল প্রেরণা। মনে জাগল অদম্য স্পৃহা বইখানি পুনঃপ্রকাশের জন্য। আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃতুল্য শ্রীশ্রীলোকনাথ মাহাত্ম্য প্রণেতা শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সেন মহাশয় আমার অভিলাষ জানতে পেরে তাঁর বহু সাধনার লোকনাথ মাহাত্ম্য অনুগ্রহ করে আমার হাতে তুলে দেন এবং নবরূপে সাধারণ্যে প্রকাশ করার অনুমতি দেন। দুর্বল আমি, অক্ষম আমি এই কঠিন কর্তব্য-ভার বহনে জানি না

কতদূর কৃতকার্য হয়েছি। তবে তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এই দুর্গম পথে পাড়ি জমিয়েছি, একথা আজ নিঃসংশয়ে স্বীকার করব। আমার প্রতি তাঁর এই অনুগ্রহ প্রদর্শনে আমি কৃতার্থ এবং কৃতজ্ঞ। তাঁর চরণে আমার শতকোটি প্রণাম।

ইতিমধ্যে হঠাৎ আমার বহুদিনের সুখ-দুঃখের সাথী পুস্তক প্রকাশক বন্ধু শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আলাপ আলোচনায় জানলাম লোকনাথ সম্পর্কে তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা। আমাকে তিনি উৎসাহ দিলেন। কিন্তু লিখব কি? মহাপুরুষ সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি! তাছাড়া আমার সে ভক্তি কই! শুনেছি লোকনাথ অন্তর্যামী। কয়েক দিন মনেপ্রাণে ডাকলুম—বাবা শক্তি দাও, দাও প্রাণে ভক্তি! বাবার দয়া হল। কে যেন মন থেকে অনবরত শোনাতে লাগল—বসে যাও হয়ে যাবে। অন্তরের এই অনুভূতির উপর নির্ভর করে একদিন সত্যই বসে গেলাম কাগজ কলম নিয়ে। লিখতে শুরু করলাম। কিন্তু কি লিখব আর কি লিখছি সে সম্বন্ধে কোন ভাবনা আমার নেই। মনে হল আমাকে উপলক্ষ করে কে যেন লিখে যাচ্ছে—যন্ত্রী ও যন্ত্রের সম্বন্ধ।

জানি একথা শোনাবে গল্পের মত, মনে হবে অলীক। তথাপি যেটা সত্য, যার অনুভূতি প্রত্যক্ষ তাকে কিছুতে অস্বীকার করতে পারি না। শ্রীশ্রীলোকনাথের অলৌকিক অনুগ্রহে সে-লেখা আজ পুস্তকাকারে ছাপা হয়ে বার হওয়ার সুযোগ পেয়েছে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শোভনা সেন-এর যুক্ত প্রচেষ্টায়। আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

এই পুস্তক সঙ্কলনে আমি শ্রীশ্রীলোকনাথ মাহাত্ম্য ব্যতীত অন্য যে-সমস্ত পুস্তক থেকে সাহায্য নিয়েছি তা হচ্ছে ধর্মসার সংগ্রহ ও শান্তিপুর পরিচয়। মহাপুরুষের ছবি দিয়ে সাহায্য করেছেন লোকনাথ কেমিক্যাল। এঁদের সকলের নিকট আমি ঋণী।

ব্রহ্মচারী বাবার জীবনী প্রকাশের দুরূহ এই কাজে সফলতার বিচার করবেন বাবার অগণিত গুণমুগ্ধ ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী। কঠিন এই কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি-বিচ্যুতি অনিবার্য। তাই সর্বপ্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি বা অসঙ্গতির জন্য সকলের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করছি। অলমতি বিস্তরেণ।

কলকাতা
১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

বিনয়াবনত
গ্রন্থকার

প্রশস্তি

মধুক্ষরা নাম লোকনাথ, মহাকবির লেখনীতে রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, "না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে"।

ঋষিরা গেয়ে উঠলেন :

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীনঃ সন্তোষধি মধু নক্তমুতোষসো।

অর্থাৎ ঋষিরা দেখেছিলেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মধুময়। ভক্ত শুধু তুমি মধু, তুমি মধু বলেই ক্ষান্ত হলেন না। আত্মসমর্পণের ভক্তিতে আকুতি জানালেন :

আমার সকলি তুমি, আমার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, বঁধূ হে' আমার সকলি তুমি।

এই ভক্তের আহ্বানেই নেমে এলেন ধরার বুকে বারাসত মহকুমার চৌরাশী চাকলা গ্রামে **মধুময় লোকনাথ**।

নিষ্ঠাবান পিতা রামকানাই, তাপসী মাতা কমলা দেবী, না হলে আসবেন কেন? ভূ-ভার হরণ করতে বারদীকে অমর করতে। রামায়ণ থেকে আরম্ভ করে চৈতন্য যুগ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি পিতা-মাতার অশ্রুজলে সন্তানের যাত্রাপথ কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ যে এক অদ্ভুত চরিতামৃত—! না হলে কি শিশু সন্তানের হাতে উপনয়নের রক্তরাগ চেলী অর্পণ করে মাতাপিতা অবোধ বালককে সন্ন্যাসের মন্ত্রে দীক্ষিত করার সুযোগ করে দেন। উপবীতের দণ্ড কমণ্ডলু হাতে দিয়ে বনগমনের পথ প্রশস্ত করেন?

এঁরা তাই করেছিলেন, আর বৃদ্ধ গুরু ভগবান এই শিশুকে বুকে নিয়ে সুদীর্ঘ পথ হিমালয়ের গুহা গহ্বরে কাটিয়ে তপস্যার চরম ফল শিশুর মধ্যে ফুটিয়ে তুলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে মণিকর্নিকার ঘাটে আত্মবিসর্জন দিলেন। শিষ্যকে বলে গেলেন: "আবার আমি জন্ম নেব, তুমি ক'র গুরুর কাজ"। তিনি কি শুধু লোকনাথ, তিনি যে ভক্তের আপন জন, বাবা লোকনাথ। যে আহ্বানে ভক্ত পরমাত্মীয়ের স্পর্শ পায়, আশ্রয় পায়। তিনি যে কারুণ্য রসে সিক্ত করে শিষ্যকে বলেছেন: "রেখে দে তোর গুরু-শিষ্য সম্পর্ক, বাপ দিচ্ছেন ব্যাটাকে"। তাই তো তিনি সকলের "বাবা লোকনাথ"। এভাবেই তিনি ভক্ত হৃদয়ে আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। ভক্তের লেখনীতে তাই আত্মনিবেদন:

আশার আলোক জ্বালো দয়াময়, নিরাশ আঁধার প্রাণে
এ অশান্ত হৃদয় কর শান্তিময়, করুণা অমৃত দানে।

তাঁর করুণা-অমৃতে সিঞ্চিত করেছিলেন বারদী নগরী এবং তাঁর পদরজধন্য—বারদী নামক মধুকর ডিঙ্গায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল অগণিত ভক্ত নরনারী।

ভক্তকে স্নেহাঞ্চলে ঢেকে বলেছেন: "বহু পাহাড় পর্বত পরিভ্রমণ করে বড একটা ধন কামাই করেছি, তোরা ঘরে বসে খাবি"। স্নেহময় পিতা ছাড়া কে কষ্টার্জিত পুঁজি সন্তানের হাতে তুলে দেয়? তিনি তাই আমাদের শোনাচ্ছেন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে---অনাদিকালের শাশ্বত বাণী: শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। তোমরা অমৃতের পুত্র, আমি সেই অমৃতের সন্ধান পেয়েছি, আহরণ করে এনেছি অমৃত। তোমাদের সেই অমৃত পরশে অমর করে তুলব। মহান পিতা তাই করেছিলেন। তাঁরই সোনার কাঠির পরশে সোনা হয়ে উঠেছিল রজনী ব্রহ্মচারী, সুরথ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, পঞ্চানন কর্মকার এবং আরো অনেকে। তাঁর

কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল "বাগান সাজাব"। তাই ঐসব সুরভিত ফুল দিয়ে বাগান সাজিয়েছিলেন।

কিন্তু সে আর কতটুকু? চেয়েছিলেন যে অনেক……! আমরা বদ্ধ জীব, তাঁর অফুরন্ত রত্ন ভাণ্ডারের খোঁজ কি জানি? তাই মোহর ফেলে কাঁচ নিয়েই ভুলেছিলাম। আমার ব্যথা ভাল করে দাও, অভাবে আছি চাকুরীর ব্যবস্থা করে দাও। ঝড়ে পড়েছি নিরাপদ কর। দাবানলে জ্বলছি রক্ষা কর। পরম দয়াল তাই করেছিলেন। হাত তুলে উত্তাল তরঙ্গ থেকে জাহাজকে নিরাপদ করেছেন, বুকে করে ভক্তকে দাবানল থেকে রক্ষা করেছেন। ব্যাধিগ্রস্ত অসার হাতে রক্ত সঞ্চালন করে সতী স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা করেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে মোহগ্রস্ত সন্তানের দিকে চেয়ে যেন বড় ব্যথায় বলে উঠেছেন: ভবরোগী পেলেন না। লোকগুলো আমাকে মানুষ ভেবে ভেবে মাটি করলে। তিনি যে কুবেরের ভাণ্ডারের মালিক! কিন্তু হায়, কোথায় সেই অধিকারী। এ যে অফুরন্ত ভাণ্ডার। কিন্তু "তুমি যারে জানাও সেই তো জানে" তাই রজনী ব্রহ্মচারী উদ্যতফণা জটাজুটধারী শিবমূর্তি দেখে ঐ রাতুল চরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সুরথ ব্রহ্মচারী বলেছেন: আমার মত পাপীও তাঁর সংস্পর্শে সোনা হয়েছে, আর তো কিছু আমি জানি না। গোস্বামী ঘনাই চিৎকার করে উঠেছিলেন বিশ্বরূপ দর্শনকারী অর্জুনের মত: পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে। দেবদেবী, প্রতিরোমকূপে দেবদেবী, গায়ের কাপড়েও। আমরা অভাজন তোমার সে কেমন রূপ তাতো দেখিনি…

তাই কেমন তব রূপ দেখিনি হরি
আপন মন দিয়ে তোমারে গড়ি।

তোমার করুণামৃতপানে আজও বহু ভক্ত ধন্য কৃতার্থ। তাঁদের কণ্ঠে শুনি তোমার জয়গান।

জয়তু জয় লোকনাথ জয় প্রাণারাম

তুমি নিত্য নিরঞ্জন নয়নাভিরাম।

তুমি বাবা এখন কোন্ রূপে কোথায় আছ জানি না। যদি ভক্ত হৃদয়ই ভগবানের স্থান হয় তবে ভক্তিহীন আমি সেই আসনেই তোমাকে আহ্বান জানিয়ে তোমার আরতি করছি :

জয় লোকনাথ রূপধর ব্রহ্ম পরাৎপর পীতবসনধর দেহি পদম্।
জয় জটাজুটমণ্ডিত আজানুবিলম্বিত ভুজযুগশোভিত
দেহি পদম্।

নিঃসম্বল আমি, প্রেমভক্তিহীন আমি আজ জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে কাণ্ডারীর খোঁজ করছি। কোথায় সেই কাণ্ডারী যিনি আমাকে এই অকূলপাথারে তাঁর অমৃত স্পর্শ দিয়ে তাঁর অভয় তরীতে তুলে নেবেন। আমি ডুবে যাব তাঁর নামে, প্রেমে গানে :

দিনের শেষে তীরে বসে ভাবছি তোমায় দয়াল বলে
পার করগো দীনবন্ধু, বৃথা সময় যায় যে চলে।
ভিড়াও তরী হে কাণ্ডারী, নাইকো সম্বল পারের কড়ি
লোকনাথ বলে দিব পাড়ি, অনায়াসে যাব চলে।
লোকনাথ নামে তরী চলে, মূল্য যে দেয় নয়ন জলে
আকুল প্রাণে ডাকলে তাঁরে নেবেন তিনি কোলে তুলে।
জানিনে তো সে দেশ কেমন মিলবে কি না অভয় চরণ
শোনাবে কি মাভৈঃ বাণী দেখা যদি সেথায় মেলে॥

——— **শোভনা সেন**

(বারদীর) শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

দুঃখপীড়িত মানবমনের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা—একটু সান্ত্বনা, একটু সহানুভূতি, স্নেহ-শীতল পরশ। এই আকাঙ্ক্ষা মেটাবার তাগিদে তার চলে অনুসন্ধান—সান্ত্বনা, সহানুভূতি, করুণার উৎস খুঁজে বার করা। যেখানে মানুষ এই উৎসের সন্ধান পায়, দিগ্‌বিদিক্ থেকে মানুষের ভিড় এসে জমে সেখানে। বহু মানুষের মিলনে সেই ক্ষেত্র হয়ে ওঠে তীর্থস্থান,—উৎসের যিনি জনক, পীড়িত মানব তাঁকে আঁকড়ে ধরে কখনো দেবতা, কখনো মহাপুরুষ, কখনো অবতার বলে।

লোকনাথ কি অবতার না শাপভ্রষ্ট দেবতা, তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের গভীরতা কত, শাস্ত্রজ্ঞানই বা অন্যান্য মহাপুরুষদের তুলনায় কতখানি, এ বিচার করার অধিকার যাঁরই থাক—তাঁর সহৃদয়তা, তাঁর স্বর্গীয় করুণা ও মৈত্রীর সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের মনে এ বিচারের প্রশ্ন জাগে না। তাঁদের স্পর্শ-কাতরতার বন্যায় সমস্ত যুক্তি, তর্ক, পরিমাণ জ্ঞান ভাসিয়ে দিয়ে, তাঁরা তাঁকে গ্রহণ করেছে পরমপুরুষ বলে, তাঁর পাদপীঠকে করে তুলেছে, পুণ্যতীর্থ।

এই পুণ্যতীর্থ বারদী—নদী-মেখলা পূর্ববঙ্গের অধীন, ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রাম।

ক্ষুদ্র সেই গ্রাম, অতি ক্ষুদ্র তার পরিচয়। হিমালয় থেকে নেমে এসেছে গঙ্গা। সে যুগের ইঞ্জিনীয়ার ভগীরথ পথ করে তাঁকে নিয়ে এসেছেন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে। উত্তুঙ্গ হিমালয়ের শীর্ষদেশ থেকে নেমে, নিম্নভূমি বঙ্গদেশ বিধৌত করে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা বঙ্গপোসাগরে মিলেছেন। চলার পথে যে সমস্ত দেশকে তাঁর

পূতবারি স্পর্শে পবিত্র করে রেখে গেছেন, তারই একটি এই বারদী। স্থান ভেদে পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করলেও মেঘনা—আসলে গঙ্গাই প্রবহমানা সমগ্র পূর্ববঙ্গের ভিতর দিয়ে। বারদী মেঘনার তীরে অবস্থিত।

বিপুল পরিধি মেঘনার বুক থেকে দূরে ধারানিবদ্ধেব কলঙ্কের মত যে রেখাটি দেখা যায়—ক্রম-অগ্রসরে তা নয়ন-মনকে মুগ্ধ করে, সে রেখা বিলুপ্ত হয়ে তার উপর ফুটে ওঠে শ্যাম ও বনবিটপী সমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র একটি গ্রাম। যে ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে, সঙ্গোপনে, নিজের ক্ষুদ্রতার পরিবেশে—কোন্ দেবতার পাদস্পর্শে, সে আজ হয়ে উঠেছে মহীয়ান—সহস্র সূর্যকিরণোজ্জ্বল হয়ে জেগে উঠেছে, লোকচক্ষুর সামনে? কে সেই মহাপুরুষ?—বারদীর গোঁসাই শ্রীলোকনাথ!

গীতা বলেন,

যদা যদ হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ধর্মের গ্লানি যখনই হয়, তখনি অধর্মের অভ্যুত্থান হয়। তখন মানুষের মধ্যে অসাধুতা, ব্যভিচার, মিথ্যা প্রভৃতি যত অন্যায় আছে সব কিছুরই প্রাবল্য দেখা যায়। একটা অন্ধ মোহে মানুষ ছুটতে থাকে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে। রোগজ্বালা, দৈবদুর্বিপাক প্রভৃতি নানা অশান্তিতে মানুষ অস্থির হয়ে ওঠে। পাপের বোঝা হয়ে উঠে ভারি। সুদীর্ঘ জীবনের পথ হয়ে ওঠে বিঘ্নসঙ্কুল—পা যেন আর চলে না, তবু তাকে চলতে হয়, জীবনের শেষ সীমা নির্দেশ করার জন্য। এমনি সময়, এমনি

প্রয়োজনের মুহূর্তে, ভগবান অবতীর্ণ হন যুগোপযোগী দেহ ধারণ ক'রে ; দুর্বল, অসহায়, ভ্রান্ত, বিপথগামী মানুষকে শোনান তাঁর অভয়বাণী :

—শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। হে অমৃতের পুত্রগণ, শোন! আর ভয় নেই। মা ভৈঃ। আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি নতুন পথের সন্ধান। মামনুসর। আমার প্রদর্শিত পথে চল, আমার আচরিত কর্ম কর—দূরে যাবে শোক, তাপ, দুঃখ-জ্বালা, চলার পথ হবে স্বচ্ছন্দ। জীবন হয়ে উঠবে মধুময়, কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠবে কবির বাণী—

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ মধু নক্তমুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

কিন্তু এর জন্য চাই প্রস্তুতি। শ্রীভগবানের নেমে আসার পথ করে তুলতে হবে সহজ। এই পথ তৈরির কাজে যাঁরা পৃথিবীতে নেমে আসেন, তাঁরাও ভগবানেরই অংশ—ভগবানের বিভিন্ন শক্তির এক একটি প্রকাশ। ক্ষণজন্মা এই সমস্ত মহাপুরুষের নিয়ে আসেন করুণাময়ের আগমনীর বাণী। লোকশিক্ষার জন্য, দিকে দিকে আবির্ভূত হন সাধারণের একজন হয়ে। তারপর নিজে আচরণ করেন, মহাজন প্রদর্শিত কর্ম—জপ, তপ—সাধারণ হয়ে ওঠে অসাধারণ। দুঃখপীড়িত নরনারী ছুটে আসে তাঁর পাদপদ্মে দুঃখের বোঝা নামিয়ে দিয়ে হালকা হতে। শুনতে চায় অভয়বাণী, সান্ত্বনার বাণী—ওগো আমার কি কোন উপায় হবে না? মধুর হেসে মহাপুরুষ বলেন—কেন হবে না! ঐ যে

সান্ত্বনার শঙ্খধ্বনি শোনা যায়!—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

জন-শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠল, পূর্ববঙ্গের অখ্যাত এক পল্লী অঞ্চলে। তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের শীর্ষদেশ থেকে নেমে এল শুভ্র দেহকান্তি নিয়ে উলঙ্গ এক যোগী, পূর্ববঙ্গের নরম মৃত্তিকায়, প্রকৃতির স্বহস্তে রচিত শ্যামস্নিগ্ধ বারদী গ্রামে। দিকে দিকে বেজে উঠল শঙ্খ। গ্রামে গ্রামে পড়ে গেল সাড়া। শতশত নরনারী ছুটে এল দিনের পর দিন। বহুজনের সমাগমে শান্ত পরিবেশ হয়ে উঠল মুখর। অখ্যাত পল্লী হল পুণ্য তীর্থস্থান। ভক্তের স্পর্শকাতর-হৃদয় উল্লাসে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কণ্ঠে উঠল ধ্বনি—জয় বাবা লোকনাথের জয়!

এমনই হয়। অন্তরে অন্তরে মানুষ কত দুর্বল, কত অসহায়! নিজের পৌরুষ নিয়ে সে যত অহঙ্কারই করুক না কেন, তার অবচেতন মনে জেগে থাকে একটি ক্ষীণ আশা,- কবে পাব এমন একটা শক্তি যা অবলম্বন করে হৃদয়ে পাব বল, অজানা পথে চলতে যিনি হবেন সহায়ঃ আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ চিনি না।

আজ থেকে ২৫০ বৎসর আগে স্বর্গ থেকে খসে পড়ল একটি জ্যোতিষ্ক। মহাশূন্য থেকে নেমে এল জ্বলন্ত একটা অগ্নিগোলক—চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে। ঠাঁই নিল বাংলার মাটিতে—চব্বিশ পরগণা জেলার অধীন বারাসত মহকুমার অন্তর্গত 'চৌরাশি চাকলা' গ্রামে। সেখানে বসতি করেন রামনারায়ণ ঘোষাল। শাস্ত্র বিশ্বাসী, দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাশীল। হিন্দু ধর্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা। আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যাত্যাগ করেন। প্রাতঃকৃত্যাদি শেষে গ্রাম পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন। উষার প্রকৃতি

—শান্ত সমাহিতা ধ্যানমগ্না যোগিনী। স্নিগ্ধ বায়ু বহে ধীরে—জননীর বুকের সমস্ত স্নেহ নিংড়ানো মমতা নিয়ে। পাখির কণ্ঠে জেগে উঠে প্রভাত-বন্দনা। পল্লীবাসী আধ-ঘুমে আধ-জাগরণে। বাতাসে কেঁপে কেঁপে ভেসে আসে সুমধুর সুর। সমস্ত নরনারীর শ্রবণে দেয় ছোঁয়া। জেগে উঠে শোনে রামনারায়ণের কণ্ঠে নিঃসৃত গুরু বন্দনা :

ওঁ অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নিত্যনৈমিত্তিক দেব-সেবা, গো-সেবা, অতিথি সৎকার। সহায়তা করেন নিত্য-সহচরী অর্ধাঙ্গিনী দেবী কমলা।

কমলা। দেবীই বটে! স্বর্গীয় সুষমায় আচ্ছাদিত দেহকান্তি, প্রস্ফুটিত কমল সদৃশ মুখচ্ছবি। স্নেহে মমতায় চিরন্তন মা। দেহে নেই আলস্য, মনে নেই বিরক্তি। অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে স্বামীর ধর্ম সাধনায় সাহায্যকারিণী। হিন্দু আদর্শে ভারতীয় নারীর প্রতীক। সাধারণ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবার। শান্ত, সুমধুর পরিবেশ। এই পরিবারে নূতন এক অতিথি সমাগত। অতিথি অভ্যর্থনায় প্রথামত আয়োজন অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব উদ্বেগ আনন্দে অপেক্ষমান।

বহির্বাটিতে রামনারায়ণ অধীর আবেগে জপ করেছেন গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

সহসা শঙ্খঘণ্টা হুলুধ্বনির সঙ্গে ভেতর বাড়ি থেকে প্রচারিত হল বহু অভীপ্সিত অতিথির আগমনের সংবাদ—কমলার গর্ভজাত একটি পুত্র। ধরার বুকে নেমে এসেছে একটি দেব শিশু। আঁতুর ঘর

আলো করে মায়ের কোলে যেন পূর্ণিমার চাঁদ। গ্রামে গ্রামে পড়ে গেল সাড়া। প্রতিবেশীরা দলে দলে এসে নবকুমারের মুখ দর্শনের সঙ্গে হাত পেতে নিল মিষ্টি, গুয়া, পান। আনন্দে মুখর হয়ে উঠল সমগ্র বাড়ি, সমগ্র গ্রাম।

অগ্রজ তিন ভাইয়ের পরে কনিষ্ঠের অধিকার নিয়ে পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীলোকনাথ। তখন বাংলা ১১৩৮ সাল। পিতা রামনারায়ণের অবচেতন মনে ছিল একটি কল্পনা। বংশের পবিত্রতা সম্পাদনের উদগ্র কামনা, পিতৃ-পিতামহের অক্ষয় স্বর্গলোক প্রাপ্তির আকুল আকাঙ্ক্ষা। অবচেতন মনের সে কল্পনা জেগে উঠল চেতন মনে। তাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে চাইলেন কনিষ্ঠ সন্তানের সহায়তায়, তাঁকে সন্ন্যাস ব্রত প্রদান করে।

দিন যায়। শিশু বেড়ে ওঠে শশীকলার মত। দেহে মনে জেগে উঠে পারিপার্শ্বিকের চেতনা।

মায়ের কোলে চড়ে হাত বাড়িয়ে শিশু ধরতে চায় আকাশের চাঁদ। মা মাথা নাড়েন অবোধ শিশুর চেষ্টায়।

তবু শিশু হাত বাড়িয়েই থাকে। ছোট ছোট দুটি বাহু— ননীর মতো কোমল। ফুলের কলির মত আঙুল নেড়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে—আয় আয়।

মায়ের সন্দেহ মানতে সে রাজী নয়। শিশু মন। দেশ কাল নিমিত্তের অতীত। ব্যবধানের, দূরত্বের জ্ঞান তার কোথায়?

তার ক্ষুদ্র হাতের মুঠোর ভিতরে, সে ধরে রাখতে চায় অখিল ব্রহ্মাণ্ড। উদ্বেলিত হয়ে উঠে মায়ের বুক। আকুল আগ্রহে চেপে ধরেন অশান্ত বুকের উপর। শিশুর সমস্ত সত্ত্বা মিলিয়ে দিতে চান নিজের দেহে মনে। কুসুম-সুবাসিত মুখের উপর চুমু খেয়ে

বলেন—আমার সোনা, আমার মাণিক। নরম গাল দুটি টিপে ধরে বলেন—এই ত আমার চাঁদ। শিশু তা মানতে রাজী নয়।

ক্ষুদ্র দুটি হাতের অতি ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে, মায়ের হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, জানিয়ে দিতে চায়— স্তোক বাক্যে সে ভুলতে রাজী নয়। পুনরায় হাত বাড়িয়ে, আঙুল নেড়ে ইসারা করে—আয় আয়। মায়ের মনে জেগে উঠে এক ফন্দি। হাত বাড়িয়ে, ইসারা করে তিনিও সুর করে চাঁদকে ডেকে বলেন :

আয় চাঁদ নড়িয়া
ভাত দেব বাড়িয়া
সোনার কপালে এসে টিপ দিয়ে যা।

শিশুর মনে লাগে সুরের দোলা। চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে, তার আগমনের প্রতীক্ষায় চোখ দুটি ধীরে ধীরে আসে বুজে। মাথাটি লুটিয়ে পড়ে মায়ের বুকে। মা তখন তাঁর নিমন্ত্রিতের নাম বদলে দেন। চাঁদের নিমন্ত্রণ বাতিল করে, ঘুমপাড়ানি মাসি পিসীকে ডেকে আনেন। বসতে দেবার খাট পালঙ্কের অভাবে, খোকার চোখের পাতার ওপর বসবার আমন্ত্রণ জানান।

ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসী!
মোদের বাড়ি এস;
খাট নেই, পালঙ্ক নেই
খোকার চোখে বসো।

কিন্তু খোকা আপত্তি জানায়। মাথা তুলতে চায়। মা হাত দিয়ে মাথাটি আস্তে আস্তে থাবড়াতে থাবড়াতে বলেন :

বাটা ভরে দেব পান
গাল ভরে খেও।

মাছের কাঁটা পায়ে বিঁধলে
ডুলিতে চড়ে যেও।

শুধু বসতে দিয়েই মা ক্ষান্ত নন। নিমন্ত্রিত অতিথিদের শুধু বসিয়ে রাখবেন? তাই আতিথেয়তা রক্ষার জন্য তাঁদের খেতে দেবেন পান—বাঙলার চিরন্তন প্রথা। অল্প স্বল্প নয়। গাল ভরে খাওয়ার ভরসাও দিচ্ছেন। বাঙালী গৃহস্থের বাড়ি। মাছ ভাত ত খেতেই হবে। কিন্তু অসাবধানে যদি সেই মাছের কাঁটা পায় বিঁধে যায় তা হলেও ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা তিনি বলেছেন, অসুবিধা হলে ডুলিতে চড়ে যেতে পারবে। অতিথিদের সম্পর্কে এত সুবন্দোবস্তের প্রতিশ্রুতিতে, খোকার আর আপত্তি থাকে না। পরম নিশ্চিন্ততায় ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের বুকে। শিথিল হাত দুটি লুটিয়ে পড়ে দু'পাশে। ছোট আমি মিশে যায় বৃহৎ আমিতে—মায়ের মোহিনী মায়া ভুলিয়ে দেয় জগৎ সংসার।

শুভদিনে শিশুর অন্নপ্রাশন হল। নাম রাখা হল লোকনাথ। লোকনাথই বটে। পরবর্তী জীবনে তার নামের সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে ভক্তদের সঙ্গে লীলা প্রসঙ্গে। উপদেশ অনুরোধ নয়, তিনি দিয়েছেন আদেশ।

শিশু এখন বালক লোকনাথ। খেলাধূলা নিয়েই ব্যস্ত। খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা। দু'জনে কত ভাব। কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারে না। খেলে রান্না-বান্না নয়—মাটির, ভাত কচুপাতার তরকারী। নির্জন বনপ্রান্তে আমগাছের তলায় শুকনো ঝড়া পাতা বালিকা ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে। আসন পেতে দেয়। পাশে বসে থাকে ফুল বেলপাতা নিয়ে, পূজারিণীর মত—দেবতার আগমনের প্রতীক্ষায়। প্রিয় সহচর লোকনাথ আসে। সহচরীর

পাতা আসনে বসে, ফুল বেল পাতা নেড়েচেড়ে পূজার অভিনয় করে। ধীরে ধীরে দেহ হয়ে উঠে ঋজু, চোখের দৃষ্টি হয় পলকহীন। শ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে যায় স্থির। বালিকা ভয় পায়। ডাকে—সাড়া না পেলে দেহে দেয় ধাক্কা।

এমনি দৃশ্য একদিন পিতার চোখে পড়ে গেল।

পিতৃমনের বহুদিনের বাসনা উদ্বেল হয়ে উঠল। আনন্দে হৃদয় ভরপুর। কনিষ্ঠ ছেলেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করাবার যে আকাঙ্ক্ষা এতদিন তিনি মনে মনে পোষণ করেছিলেন, তা পূরণ হবার উপযুক্ত লক্ষণ এই ছেলের মধ্যে বর্তমান দেখে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটলেন ভগবান গাঙুলীর বাড়ি।

ধন্য পিতা! আত্মজ সন্তানকে গৃহত্যাগী করার অভিলাষ রামনারায়ণের চরিত্রের একটা অসামান্য দিক। অভাবনীয় পিতৃ-চরিত্র—সচরাচর মেলে না। ভগবান গাঙুলী শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত লোক। মহাজ্ঞানী মহাজন। দেশবাসী সকলে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিয়েছে বিনা দ্বিধায়। বিপদে আপদে সহায়, সংশয়ে বুদ্ধি পরামর্শদাতা।

গ্রামের এক প্রান্তে গাঙুলী মহাশয়ের বাড়ি। ভাই, স্ত্রী পুত্র নিয়ে তিনি বাস করেন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণের গৃহ। প্রাচুর্যের ঘটা নেই—আছে প্রয়োজনীয় স্বচ্ছলতা। পরিবেশে একটা শান্ত ভাব—হিন্দু সংস্কৃতির সজীবতা। ভগবান জ্ঞানের পূজারী। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সব কিছু জানার প্রবণতা। জ্ঞানযোগী-কর্মযোগী নন। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী না হলেও অনাসক্ত মনোভাব—সংসারে থেকেও নেই। ঘরকে করেছেন বাহির, বাহির হয়েছে ঘর। বাইরের ঘরের সামনে ছোট্ট একটু আঙিনা। তারই এক পাশে একটি বেল ও কয়েকটি ফুল গাছ আর সযত্নরক্ষিত তুলসী মঞ্চ।

ঘরের বারান্দায় আসনে বসে, ভগবান গাঙুলী শাস্ত্র পাঠে নিমগ্ন। তালপাতার পুঁথি। পৃষ্ঠা খুলে তখনও মনোযোগের সঙ্গে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছেন। পলকহীন দৃষ্টির সামনে থেকে পুঁথির লেখা মুছে গেছে। মন চলে গেছে দূরে। পুঁথির লিখিত বাক্যের তত্ত্বানুসন্ধানে। ধ্যানমগ্ন যোগী।

রামনারায়ণ এসে উপস্থিত। ভগবানের তদ্‌গত ভাবে বাধা দিলেন না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সহজ জ্ঞান ফিরে এলে ভগবান উপলব্ধি করলেন রামনারায়ণের উপস্থিতি। ইঙ্গিতে আসন নির্দেশ করে বললেন: বসুন।

রামনারায়ণ গুটানো কুশাসন পেতে নিয়ে বসলেন। পুঁথি গুছিয়ে নিয়ে ভগবান চাইলেন রামনারায়ণের মুখের প্রতি, সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

বললেন—কি সমাচার ঘোষাল মশাই?

ঘোষাল মহাশয় পুত্রের সমস্ত ঘটনা বললেন। তারপর তাঁর মনোভিলাষ ব্যক্ত করলেন বহুদিনের।

আপনি শাস্ত্রজ্ঞ লোক। আপনার নিকট শাস্ত্রের ব্যাখ্যা আমি আর কি করব! সংসারে খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটাই ত বড় কথা নয়! মনুষ্যজন্ম যাতে সার্থক হয়, তার উপায় চিন্তা করতে হবে। শুনেছি বংশে একজন সন্ন্যাসী হলে, তার কুল পবিত্র হয়ে যায়—পিতৃ-পিতামহের অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। নিজের দ্বারা ত আর এ জন্মে হল না! তাই ভাবছি—

—ভাবছেন একটি পুত্রকে সন্ন্যাস দেওয়াবেন?

—ভাবছি ত তাই।

—আপনার স্ত্রী রাজী হবেন?

—এতদিন হন নি, প্রথম তিন ছেলের সম্পর্কে কিছুতেই রাজী ছিলেন না। কিন্তু এবার নিজেই বলেছেন।

—বলেছেন ?

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে রামনারায়ণ বললেন : আজ্ঞে, লোক-নাথকে সন্ন্যাস দেওয়া মনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা। আরও একটি বাসনা—

—কি বলুন ? ভগবান প্রশ্ন করেন।

—সে ভার আপনাকেই নিতে হবে।

—আমাকে ! বিস্মিত পণ্ডিত চেয়ে থাকেন রামনারায়ণের মুখের দিকে। যেন কত বড় অসম্ভব কথা রামনারায়ণ বলেছেন।

—হা, তা বই কি ! আপনার মত পণ্ডিত, আপনার মত শাস্ত্রজ্ঞ এ তল্লাটে আর একজনও আছে কি ? ব্রাহ্মণত্বের আপনি যথার্থ আদর্শ। দেশের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল, এ ত আপনারই করণীয়। পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষী পিতার নির্ভর করার মত, আশ্রয় করার মত এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান কোথায় ? গ্রামের জনক আপনি, লোকনাথের শুভাশুভ আপনি দেখবেন না ত দেখবে কে ?

যথার্থ কথা। ভগবান চিন্তিত হলেন। গভীর চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে প্রশান্ত মুখের উপর। ভাবছেন—তিনি জ্ঞানের পূজারী, নেতি নেতি করে কি আছে কি নেই ; কি উচিৎ কি অনুচিত, বিচার করে তত্ত্ব অনুসন্ধানে কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনের সুদীর্ঘ সময়, কিন্তু পেয়েছেন কি ? শাস্ত্রের বর্ণিত কর্মযোগের কথা তিনি জানেন, কিন্তু আচরণ করে দেখেন নি। দেখবার ইচ্ছাও তাঁর জাগে নি। এতদিনের জ্ঞানের সাধনায় তিনি যা পেয়েছেন, প্রাপ্তির পূর্ণতায় তাতে জেগেছে সংশয়। ক্রমবর্ধমান অতৃপ্তি মনের ভিতর জাগিয়ে তুলেছে নতুন পথের অনুসন্ধানস্পৃহা। ক্ষীণ একটা আলোর রেখা যেন তিনি দেখতে পেলেন তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে। তিনি জেগে উঠলেন। চিন্তাজগত থেকে ফিরে এল

তাঁর মন। রামনারায়ণের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে বললেন: আমাকে ভাবতে দিন ঘোষাল মশাই। ভেবে, পরে আমি আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানাব।

রামনারায়ণ ভগবানের মনোভাব বুঝলেন। তাই দ্বিরুক্তি না করে প্রণাম জানিয়ে চলে এলেন।

কমলার সংসার। লক্ষ্মীর দয়ার কার্পণ্য নেই। ধনে জনে বাড়-বাড়ন্ত। গোলায় ধান, গোয়ালে দুধ, পুকুরে মাছ। গাছে গাছে নারকেল, আম, কাঁঠাল। বার মাসে তের পার্বণ। আত্মীয়-স্বজন অতিথি-অভ্যাগত। সমাদরের অভাব নেই। সুখের সংসার। সংসারে সর্বকাজে কমলা।

কিন্তু এত সুখের মধ্যেও কোথায় যেন রয়েছে একটা অস্বস্তি—কমলার বুকের মাঝখানে।

ঘড়ির কাঁটার মত তিনি নিয়োজিত সব কাজে। একটু ত্রুটি ধরবার সাধ্য নেই। স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি। তাঁর বুদ্ধি, বিবেচনা শাস্ত্রজ্ঞান এর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। তাই স্বামীর নির্দেশে, কনিষ্ঠ পুত্রের সংসার ত্যাগের সঙ্কল্পে তিনি আপত্তি জানান নি। প্রথম তিন পুত্রের কারো সম্পর্কে এ ব্যবস্থায় আগে আপত্তি জানালেও এবারে তিনি সম্মতি দিয়েছেন স্বেচ্ছায়। স্বামী বলেন, এই ভগবানের নির্দেশ। আদর্শ স্ত্রী স্বামীর ধর্ম বিশ্বাসে সায় দিয়েছেন। কিন্তু জননীর হৃদয় তা মেনে নিতে পাচ্ছেন না। স্ত্রী ও জননীর আদর্শে তাই বেঁধেছে সংঘাত। অধ্যাত্ম জীবন ও লৌকিক জীবনের বিরোধ। পুণ্যলোভাতুরা নারীর, সর্বস্ব দানের ফলস্বরূপ অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তির কামনার সঙ্গে, সর্বস্ব হারাবার বেদনার অনুভূতি, তাকে তাই অহরহ পীড়া দিচ্ছিল। পারলৌকিক সুখ বোধ ত দু'দিনের—ক্ষণস্থায়ী। দেহবিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা শেষ

হয়ে যাবে। চিরন্তন যে সুখ, যে শান্তি তাই ত সন্তানের জন্য মায়ের কাম্য। আপাত সুখের লোভে তাকে অবহেলা করা উচিত নয়।

স্বামীর এই যুক্তির বিরুদ্ধে কমলার বলার আছেই বা কি? তবু মায়ের মন সায় দিতে চায় না। সব কাজের ফাঁকে মন কেঁদে উঠে।

দূর ছাই! কমলা আর ভাবতে চায় না। বিষয়ান্তরে মনো-নিবেশ করে ভুলতে চায় এ চিন্তা।

কিন্তু চাইলেই কি পারা যায়? ভগবান কেন এত দুর্বল করে মায়ের মন গড়েছেন? স্বামীর ত কোন দুঃখ নেই। বরং আনন্দে তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত। সন্তানের গৃহত্যাগের সবরকম প্রস্তুতির জন্য তিনি সচেষ্ট। ভগবান গাঙ্গুলীর সঙ্গে দিবারাত্র পরামর্শ। শাস্ত্র ঘেঁটে কত নজির, কত উপমা, কত উপদেশ তিনি নেন। ব্রাহ্মণবংশের ছেলে, এতখানি বয়স হতে চলল, কিন্তু লোকনাথের বিদ্যাশিক্ষার কোন চেষ্টাই তিনি করলেন না। পরা বিদ্যা—যা জানলে সব জানা যায়, সে বিদ্যাই ত প্রকৃত বিদ্যা! যা পেলে সব পাওয়া যায়। সংসারের বিষয়াসক্তদের মত কি প্রয়োজন অর্থকরী বিদ্যায়?

বড় কথা, ভাল কথার এমনই মোহ যে, মানুষ তাকে বিচার করে দেখবার সুযোগ পায় না। টেনে নিয়ে যায় আপনার শক্তিতে, দূরে—। এমনি কোন এক মুহূর্তে মায়ের মুখ থেকে এসেছে যে কথা সেটাই হয়ে উঠেছে প্রধান! কিন্তু সেটাই কি মায়ের মনের কথা? পাঁচজনের ইচ্ছায় যে কথাটা বলেছে, সেটাই হল সত্য—মায়ের অন্তরের দিকে কেউ চেয়ে দেখল না! এমনি দুর্ভাগ্য, সে অন্তরটি পাঁচজনের সামনে খুলে ধরারও না হল সুযোগ, না হল সাহস। অন্তরের এই ব্যাখ্যা অন্তরে গোপন

রেখে তিনি সংসারের সব কাজে বিলিয়ে দিতে চাইছেন নিজেকে।

দিন যায়। বালক লোকনাথ কৈশোরের পাদপীঠে সমাসীন। শুভ উপনয়ন দিন সমাগত। সেবার উপনয়ন দেওয়ার ঐ দিনটি ছিল প্রশস্ত। তাই দেশের প্রায় ঘরে ঘরে ঐ তারিখে উপনয়নের ঘটা পড়ে গেল।

লোকনাথের উপনয়ন। অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছেন স্বনামধন্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভগবান গাঙ্গুলী।

সমস্ত গ্রামে সাড়া পড়ে গেল। বৈশিষ্ট্যে, অভিনবত্বে খবরটি হয়ে উঠল সকলের আলোচনার বস্তু। যজ্ঞোপবীত ধারণ নূতন কিছু নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করার যে সঙ্কল্প সেটাই সব চেয়ে অভিনব। শুধু তাই নয়, এই উপলক্ষে চিরজন্মের মত গৃহত্যাগ করে যাবেন পরম শ্রদ্ধেয় ভগবান, লোকনাথের গুরুপদে বৃত হয়ে।

বেণীমাধব গ্রামের আরেকটি ছেলে। লোকনাথের খেলার সঙ্গী। তারও ঐ দিন উপনয়ন। বন্ধুর গৃহত্যাগের সংবাদ তাকে চঞ্চল করে তুলল। স্থির করল, বন্ধুর সঙ্গে সেও হবে বনবাসী সন্ন্যাসী।

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি সঃ বান্ধবঃ।

যোগ্য সহচর, অকৃত্রিম বন্ধু!

বেণীমাধব তার মনের কথা প্রকাশ করল অভিভাবকদের কাছে। অভিভাবকেরা আমল দিলেন না। ভাবলেন ছেলে-মানুষের মন, বাল্যবন্ধুর আসন্ন বিরহের ব্যথা-কাতরতার এই অভিব্যক্তি। কিন্তু দু'চারদিন পরে তাঁদের এই ভুল ভাঙল বালকের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে। নানা প্রকার প্রবোধ, আত্মীয়-

স্বজনের কান্নাকাটি, যুক্তি তর্ক, সন্ন্যাস জীবনের কঠোরতার ভয়াবহ চিত্র কোনটাই তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারল না। এমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! বালকের দৃঢ়তার কাছে অভিভাবকেরা নতি স্বীকার করলেন। অনন্যোপায় হয়ে তাঁরা মত দিলেন এবং বেণীমাধবের উপনয়ন ও ব্রহ্মচর্য সাধনের গুরুরূপে ভগবান গাঙ্গুলীকেই তাঁরা নির্বাচন করলেন। অখণ্ড বিধিলিপি!

আজ উপনয়ন। ভোর থেকে কমলার একটুও অবসর নেই। আত্মীয়-অনাত্মীয়, আহুত-অনাহুতে বাড়ি ভরপুর।

ভেতর বাড়ির উঠানে রান্নার আয়োজন করা হয়েছে। নিমন্ত্রিত বাদেও কত লোক আহার করবে তার হিসাব নিয়ে রামনারায়ণ ব্যস্ত। প্রতিবেশী স্বজাতীয়া এক মহিলা নিয়েছেন ভাঁড়ার ঘরের ভার। নিমন্ত্রিতা আত্মীয়াদের ভেতর অনেককে সাধ্যানুসারে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে।

বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয় খুব ব্যস্ত। তাঁর তৎপরতা ও ব্যস্ততায় অপরিচিতদের মনে হবে যে, যজ্ঞোপবীত ধারণ রামনারায়ণের পুত্রের, না কি ভগবান গাঙ্গুলীর! লোকটির এমনি স্বভাব।

পর বলে যেন কাউকে ভাবতেই জানেন না। বসুধৈব কুটুম্বকম্। শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে যখন বসেন তখন থাকেন অন্য লোকে, যেন এ জগতের নয়। মাটির মানুষের সঙ্গে যেন কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর যে পৃথিবীতে কোন প্রয়োজন থাকতে পারে তা মনে করা যায় না। পারিপার্শ্বিকের কোন চেতনা তাঁর থাকে না।

আবার বৈষয়িক ব্যাপারে যখন লিপ্ত হন, তখন তাঁর চেয়ে নিষ্ঠাবান বৈষয়িক কেউ হতে পারে এ যেন ভাবাই যায় না। পরস্পরবিরোধী স্বভাবের এমনি অপূর্ব সমাবেশ।

কমলার উৎসাহ আজ সকলের চেয়ে বেশী। আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ-খবর নেওয়া, নিমন্ত্রিতা আত্মীয়াদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কারো দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা, কে কে দই কলা দিয়ে মুড়ি খাবে, কে যেন টাকির খেজুর গুড় খাবে বলেছে তার জন্য ত্রস্তপদে সেই জিনিস এনে উপস্থিত করা—ঐ যে একটি মেয়ে নারকেল ভাঙতে গিয়ে হাত কেটে ফেলল, ছুটে গিয়ে গাঁদাফুলের পাতা এনে বেটে হাতে বেঁধে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। নির্ধারিত কোন কাজ নেই, তবু সকল কাজে তিনি আছেন। আজ তাঁর গৌরবের দিন। উপনয়ন ত আরও তিন ছেলের দিয়েছেন, কিন্তু এমন আয়োজন, এত ধুমধাম ত আর হয়নি। কেন হয়নি? ছুটোছুটির ফাঁকে প্রশ্নটি মনে জেগেছে।

শুধু যজ্ঞোপবীত ধারণই ত অনুষ্ঠানের শেষ নয়। অনুষ্ঠান শেষে, ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করে লোকনাথ যাবে গৃহত্যাগ করে, চির জীবনের মত। এই বাড়ি, এই ঘর, বাপ-মা, ভাই-বোন সব হয়ে যাবে তার পর। কারো কোন আকর্ষণ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে না। সুদীর্ঘ এগার বছর ধরে যাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন, আজ থেকে সে আর কমলার কেউ নয়।

সহসা বুকটা কেমন করে উঠল! মনে হল বুকটা একেবারে খালি হয়ে গেছে। দু-হাত দিয়ে খানিকক্ষণ চেপে ধরে সামলে নিলেন। কি কাজে যেন এই দিকে এসেছিলেন, ভুলে গেছেন। ও! লোকনাথের পরার চেলি নিতে হবে।

ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চেলিটা খুঁজে বেড়ালেন। কাজের সময় যদি কোন জিনিস হাতের কাছে পাওয়া যায়!

বিরক্তিতে মন ভরে উঠল। কিন্তু কার ওপর বিরক্তি? তিনি নিজেই ত রেখেছেন। এমন ভুলো মন!

কোথায় যে রেখে গেলাম! ওরে ও—

থাক, ওকে ডেকেই বা কি হবে? আহা! মেয়েটার মুখের দিকে তাকান যায় না। খেলার সাথী। সারাদিন লোকনাথের সঙ্গে যেন ছায়ার মত লেগে আছে। ফুট-ফরমায়েসের অন্ত নেই, কিন্তু তবু বিরক্তি নেই। এই ত সেদিন, কি একটা ত্রুটির জন্য কি গালাগালই না করল, তবু মেয়েটার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়াল না।

—জ্যেঠাইমা!

—কে রে? সুমি! দেখত মা, তোর লোকনাথদার চেলিটা কোথায় রেখেছি?

—তখন জ্যেঠামশাইয়ের হাতে দিলে না? তিনি ত নিয়ে গেলেন।

—ওঃ তাই ত, কি যে ভুল!

—জ্যেঠাইমা! ভাঁড়ার ঘরে মা তোমাকে ডাকছেন।

—বল গে যাচ্ছি।

ঘরের খুঁটিনাটি কাজ করে কমলা ঘর থেকে বের হলেন। বাইরে থেকে দরজা টেনে শিকল তুলে দিতে দিতে ভাবলেন কাজের বাড়ি, এত লোকের ভীড়, কখন কোনটা খোয়া যায় কে জানে? কিন্তু সর্বদা তালাচাবি লাগিয়ে দেবেন এটা তিনি পারবেন না। একবার খোল, একবার বন্ধ কর। ঝঞ্ঝাট! কে করে বাবা? নিজের নেই কাজের অন্ত। কি-ই বা আর যাবে? হয়ত একখানা কাপড়, নয়ত ঘটিবাটি। সোনা-দানা থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি!

লোকে বলে স্ত্রীলোকের পরম ঐশ্বর্য স্বামী—মাথার মণি। কিন্তু সন্তান?—হৃৎপিণ্ড।

মণি হারিয়ে গেলে ফণী পাগল হয়ে যায়, কিন্তু বেঁচে থাকে।

হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে গেলে, সে কি বাঁচে? নাঃ, কি যা তা ভাবছি! শুভদিনে শুভ কাজে যত অনাছিষ্টি কথা!

এমন সময় একজন বর্ষীয়সী মহিলা এদিকে এলেন।

এই যে বৌমা! লোকনাথকে একবার দেখতে গেলে না? কি চমৎকার মানিয়েছে! মুখে চন্দনের ফোঁটা, পরনে লাল চেলি—যেন শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক। একবার গিয়ে দেখে এস। মহিলা আপন কাজে চলে গেলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক? অভিষেকই বটে! সব আয়োজন শেষ, অভিষেকের সময় আসন্ন; হঠাৎ পিতৃ-আদেশ হল, বনে যাও।

পাড়ার যাত্রাগানে কমলা রামের বনবাস দেখেছেন। তখনও লোকনাথ জন্মায়নি। সমস্ত লোকের সে কি কান্না! যে মহিলাটি এইমাত্র বলে গেলেন, তাঁর কথাটাই বেশি করে মনে পড়ল কমলার। এক ফোঁটা জলও তার চোখ দিয়ে গড়ায় নি। আশপাশের সকলের কান্না দেখে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন— মাগীগুলো যেন কি! একটু কিছু হলে চোখের জলে নাকের জলে একাকার। এমন আলগা চোখের জল!

চিরবন্ধ্যা নারী, সন্তানের মর্ম সে কি বুঝবে!

লোকনাথের অভিষেক। কোন্ অভিষেক? সন্ন্যাস নেবার?

রামচন্দ্রের অভিষেক হয় নি, হয়েছিল বনবাস। ওর বেলা হবে দুটোই। তবু রামের সঙ্গে ছিল সীতা, ভাই লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ রামের সব কাজে সাহায্য দিয়েছে—শিষ্যের মত সেবা করেছে। সীতা দিয়েছে সান্ত্বনা, শ্রান্তিতে করেছে শুশ্রূষা।

সঙ্গে বেণীমাধব থাকবে। ওকে খুব ভালবাসে—ভায়ের অধিক। ওর সাহচর্যে কিছুটা সান্ত্বনা, সাহায্য হয়ত হবে।

কিন্তু সেবা করবে কে? গুরুদেব বুড়োমানুষ, নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। ওকে কে দেবে রেঁধে, কে করবে আহার্য পরিবেশন? গ্রীষ্মের রাতে বনের গুমোটে গরমের ভিতর যখন ঘুমুতে পারবে না—ছটফট করতে থাকবে, রাত জেগে কে করবে হাওয়া? শীতের রাতে বুকের রক্তের সেঁক দিয়ে কে করে তুলবে তপ্ত? মশা, মাছি, জন্তু-জানোয়ারের, হাত থেকে কে-ই বা ওকে রক্ষা করবে?

স্বামী বলেন: ভগবান। কোন্ ভগবান? গুরু ভগবান, না স্বর্গের দেবতা?

দেবতা ত মানুষ নন। তার ত মানুষের মত রক্তমাংসের শরীর নয়। হৃদয় বলে কোন বস্তু তার নেই। সে ত পাষাণ।

সন্ন্যাসই যদি মানুষের জীবনে একমাত্র প্রেয় এবং শ্রেয় হয় তবে তাকে সন্ন্যাসী করে কেন সৃষ্টি করা হয় নি? কি দরকার ছিল গর্ভধারণের যন্ত্রণা ভোগ করার—বুকের রক্ত দিয়ে এই এগার বছর ধরে মানুষ করে গড়ে তোলার?

লোকে বলে, পূর্বপুরুষদের অক্ষয় স্বর্গবাস। নাই বা হল সে স্বর্গবাস যে স্বর্গে যাওয়ার পাথেয় নিজেরা সঞ্চয় করতে পারেন নি!

স্বার্থপর!

ছিঃ! এ কি অভিযোগ! এ অভিযোগ ত শুধু পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে নয়, তার স্বামীর বিরুদ্ধেও বটে! মনের অজ্ঞাতে পাপ নেই।

হিন্দু স্ত্রী, গোপন পাপের ভয়ে কেঁপে উঠল তার দেহমন। মনে মনে স্বামীর নিকট ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে হাত জোড় করতে গিয়ে মনে পড়ল, অনেকক্ষণ তিনি ঘরের শিকল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, ভাঁড়ার ঘরে যাওয়া এখনও হয়নি।

বেলা অবসন্ন। 'শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ।

নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতদের খাওয়া সবে শেষ হয়েছে। কিন্তু আর ত সময় নেই! দিবা অবসানের পূর্বেই রওনা হতে হবে মহাপ্রস্থানের পথ-যাত্রীদের। এখনই তার আয়োজন না করলে ত চলবে না!

ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি পড়ে গেল।

ভিতর বাড়িতে ঢুকে রামনারায়ণ দেখলেন সব আয়োজনই ঠিক আছে এবং তা করেছেন কমলা। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত কমলা ধীর স্থির। মুখে চোখে শোকের কোন প্রকাশ নেই। এমনি কঠিন, এমনি রুক্ষ।

রামনারায়ণ ক'দিন ধরেই পত্নীর ভাবান্তর লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু সান্ত্বনার কোন কথা তাঁকে বলেন নি। প্রয়োজন নেই বলে নয়, ভয় ছিল পাছে কিছু বলতে গেলে ভেঙে পড়েন—শুভ যাত্রাপথ করে তোলেন অশ্রুপিছল, তাঁর এতদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার পথে বাধা পড়ে।

কিন্তু তাই বলে কমলার এ মূর্তিও তিনি কল্পনা করেন নি। তাঁর কঠিন কর্তব্যপরায়ণ পুরুষ মন মুহূর্তের জন্য হয়ে উঠল সঙ্কুচিত। সুপ্ত শোকের তরঙ্গাঘাতে প্রাণ হয়ে উঠল বেদনা-চঞ্চল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যই। নিমেষে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, নিজেকে সামলাতে কিনা কে জানে?

শুভক্ষণে যাত্রা হল শুরু। সকলের আগে লোকনাথ, মাঝে বেণীমাধব, পিছনে গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলী। সব পিছনে চলেছেন কমলা, রামনারায়ণ, আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসী আরও অনেকে। সবাই চলেছেন গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিতে। অভাবনীয় দৃশ্য! অনৈতিহাসিক ঘটনা।

পড়ন্ত বেলার সূর্য ধীরে নেমে যাচ্ছে [illegible] পথে। এখানেই গ্রামের শেষ। ভগবান [illegible] নিষেধ [illegible]েন,
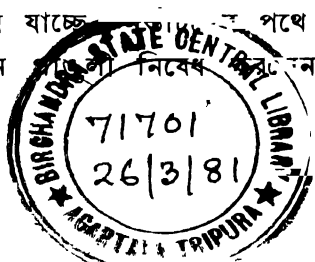
জনতাকে আর অগ্রসর হতে। সবাই দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটা কঠিন স্তব্ধতা সবার দেহমনে প্রকাশমান।

শুধু পিতা রামনারায়ণ অনুচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করছেন যাত্রাপথের শুভ কামনা করে মন্ত্র—শিবাস্তে সন্তু পন্থানম্।

অগ্রগামী দল ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে দূরে। গোধূলির আলো ম্লান হয়ে এসেছে। আঁধারের যবনিকা ছেয়ে ফেলল সকলের দৃষ্টি পথ। সহসা ক্ষীণ আর্তনাদে কেঁপে উঠল সন্ধ্যার আকাশ বাতাস।

—ওরে আয়, ফিরে আয়, আমার সোনা, আমার মাণিক, আমার লোকনাথ!

তারপর সব নীরব। স্বামীর কঠিন বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল কমলার ক্ষীণ দেহলতা। সূর্য হারিয়ে গেল অস্তাচলে।

এগারো শ' আটচল্লিশ সাল।

দেশের রাজা মুসলমান। বাংলার নবাবী আমলের রবি অস্তমিত প্রায়। দেশে সুশাসনের চেয়ে কুশাসনই ছিল প্রবল। শাসন-কর্তা ছিলেন চরিত্রহীন, বিলাস-ব্যসনে মগ্ন। প্রবলের অত্যাচার, ধর্মের নামে অনাচার, নারীর অসম্মান, সব কিছুই চলছিল অব্যাহত ভাবে। প্রতিকার করার, বাধা দেওয়ার মত লোকের ছিল অভাব। উদার কোন মতবাদ, জনমঙ্গলসূচক কোন আন্দোলন বাংলা দেশে তখন ছিল না।

দেশের রাস্তাঘাট ছিল বিঘ্নসঙ্কুল। পথের দু'পাশে বন-জঙ্গল। হিংস্র জীব-জন্তুর নিরাপদ আবাস। চোর ডাকাতদের গোপন আড্ডাস্থল। ধনসম্পদ নিয়ে একা চলার সাধ্য কোন পথিকের ছিল না। রাত্রিবেলা দূরের কথা, দিনেরবেলায়ও প্রকাশ্য রাজপথে রাহাজানির অভাব ছিল না।

সামাজিক অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। পাল এবং সেন রাজাদের প্রচেষ্টায় যে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও শ্রেণীভেদ তথা কৌলিন্য প্রথা বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার বিষময় ফল দেখা দিয়েছিল তখনকার সমাজ ব্যবস্থায়। ব্রাহ্মণের প্রাধান্যে ব্রাহ্মণেতর জাতির কোনরূপ সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল না। জাতের নামে ছিল বজ্জাতি—শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার। শাস্ত্রীয় আচারপরায়ণতায় ছিল কঠোরতা—বৌদ্ধপ্রভাবমুক্ত সদ্যোজাগ্রত সনাতন ধর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

ধর্মকে প্রাণের সঙ্গে খুব কম লোকেই গ্রহণ করেছিল। মান-মর্যাদা হারাবার ভয়, উৎপীড়নের ভয় ও সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়েই গ্রহণ করেছিল বেশির ভাগ লোক। তাই অনুষ্ঠানই ছিল প্রধান, মূল ধর্ম ছিল দূরে। এই আবহাওয়ার পরিবর্তন এল এবং তার প্রয়োজনও ছিল—শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিমূলক বৈষ্ণব আদর্শবাদে।

শ্রীচৈতন্য প্রেম এবং ভক্তিকেই মূল জিনিস বলে প্রচার করলেন। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের তুচ্ছতা ঘোষণা করে জাতিভেদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন জেহাদ। ছোটবড়কে টেনে আনলেন এক মহামিলন ক্ষেত্রে। অন্ত্যজকে দিলেন কোল, মানুষের মধ্যে এল সাম্যমৈত্রীর প্রেরণা। রূপ-সনাতন হল হিন্দু, প্রেমের বন্যায় ভেসে গেল সমগ্র বাংলা। বাংলার কবি গেয়ে উঠলেন মানুষের মনের চিরন্তন সত্য—

শোন রে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

কিন্তু দেশের এই সামাজিক এবং ধর্মীয় পরিবেশের প্রভাবমুক্ত আচার্য ভগবান গাঙুলী বেরিয়ে এলেন নাবালক শিষ্য দুটিকে পুরোভাগে নিয়ে, উদ্দেশ্য নতুন করে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের আদর্শে

কঠোর ব্রহ্মচর্য ও যোগসাধনার অপূর্ব পরিণতি দেখানো। প্রচলিত যুগ-আদর্শের এক ব্যতিক্রম।

বীর্যবান নৈষ্ঠিক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। সঙ্কল্পে দৃঢ়তা আর কর্তব্যে নিষ্ঠা তাঁকে দিয়েছে জয়মাল্য। কিন্তু যুগের প্রভাব মুক্ত করে শিষ্যদের রেখে যেতে পেরেছিলেন কি? বেণীমাধবের কথা জানি না, কেননা চন্দ্রনাথ পাহাড় পর্যন্ত বাল্যসুহৃদের সহগামী হয়ে তারপর চলে গেলেন কামাখ্যা পাহাড়ের পথে—লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু লোকনাথের জীবনে সমাজ সংস্কারের যে-সমস্ত কার্যকলাপ দেখা গেছে, যুগ-প্রভাব মুক্তির কোন লক্ষণ তাতে প্রকাশ পায় নি! বরং প্রকাশ পেয়েছে পৌরাণিক ও আধুনিকের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাবার প্রচেষ্টা—কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক।

গ্রামের পথ। পথের দুই পাশে বন। মাঝে মাঝে গৃহস্থের দু' একটি বাড়ি। পুকুর ঘাট, নারকেল গাছের বাগান। কোথাও বা বাঁশঝাড়। নতুন জীবনের ভাবে অনুপ্রাণিত দুটি বালক চলেছে অজানার সন্ধানে—পিছনে পড়ে আছে বাড়ি-ঘর, বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন। নতুনের মোহে প্রাণ ভরপুর। স্বজন-বিচ্ছেদের কোন ব্যথা, কোন কাতরতা সেখানে রেখাপাত করে নি। অথবা এই কি জন্মান্তরীণ প্রেরণা? কে জানে!

সন্ধ্যার স্বল্প অন্ধকার ক্রমে হয়ে এল গভীর। পথের দুপাশের বনজঙ্গল আর বড় বড় গাছ পথের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে অন্ধকারকে করে তুলেছে আরও নিবিড়। দূরে গৃহস্থ বাড়িগুলি থেকে মাঝে মাঝে আলো দেখা যায়। তাতে পথের অন্ধকার দূর না হলেও লোকবসতির কথাটা জানিয়ে দেয়। এমনি করে চলেছে সুদীর্ঘ পথ।

গৌরীপুর, মধ্যমগ্রাম, পাতিপুকুর, কলকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানটী, কালীঘাট। সুতানটী গ্রাম হলেও তার কৌলীন্য বেড়েছে,

কেননা ইংরেজরা এখানে সওদাগরী করে। সুতরাং নানাদেশ থেকে লোক সমাগমে গ্রামটি সর্বদাই সরগরম। ভাল ভাল বাড়ি, প্রশস্ত রাস্তা। সওদাগরী জাহাজ, বড় বড় নৌকা ভাগীরথীর ঘাটে বাঁধা। বড় বড় সওদাগরী অফিস আর সাহেব সুবোদের বাংলো রাতের অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় জ্বলজ্বল করে।

তারপর আবার শুরু হল নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পায়েচলা পথ। এই সব পথে দিন-দুপুরেও ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতি প্রায়ই ঘটত। তাই বলে লোক চলাচলেরও কমতি ছিল না। দুস্তর এই পথ অতিক্রম করে হিন্দুর পুণ্য তীর্থ কালীঘাট। একান্ন পীঠের এক পীঠ।

সতীদেহের অংশস্পৃষ্ট পুণ্যভূমি। এইখানেই হল যাত্রার প্রথম পর্বের সমাপ্তি। যাত্রীরা ক্লান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ্রামের প্রয়োজনে আশ্রয় নিলেন যাত্রীশালার ঘরে।

কয়েক দিন নতুন জায়গার বৈচিত্র্যে কেটে গেল। ঘরছাড়া দুটি বালক ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল।

কত যাত্রী আসে দেবী দর্শনে। কালীমূর্তি। পুজো দেয়। ভিখারীদের প্রসাদ নিয়ে কাড়াকাড়ি—পুণ্যার্থীর গলায় মালা পরিয়ে পয়সা আদায় করার যন্ত্রণাদায়ক ফন্দি। তীর্থস্থানের ভিখারী—যাত্রীরা বিব্রত, বিরক্ত তবু প্রতিবিধান করতে পারে না। মায়ের আশ্রিত এই ভয়। যদি মা রাগ করেন!

এক একদিন ভিখারীদের অত্যাচার সহ্যের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। কিন্তু শাসন নেই। কে করবে? যাত্রীরা সকলেই বিদেশী, অসহায়। শুধু কি ভিখারী? পাণ্ডাদের অত্যাচার প্রাণান্তকর। পুজো দেবার মজুরী নিয়ে এমন জুলুম শুরু হয় যে, তীর্থযাত্রীকে সর্বস্ব দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে হয়।

কালীঘাটের পাশ দিয়ে আদিগঙ্গা। আগে নাকি এখান দিয়ে

গঙ্গা প্রবাহিত হত। এখন শুধু একটি খালের মত ক্ষীণ জলধারা। অস্থি বিসর্জন, শ্রাদ্ধাদি কাজ অনেকেই এখানে এসে করেন। যাত্রী নিবাসে কয়েকজন সন্ন্যাসী। মাথায় বড় বড় জটা। চলতে গেলে লুটিয়ে পড়ে। লেংটি পড়া। সারা গায়ে ছাই মাখা। এক হাতে বড় চিমটা, আর এক হাতে কমণ্ডলু! অদ্ভুত জীব! ভারী মজা লাগে দু'জনের।

সাধুরা ধুনি জ্বেলে চোখ বুজে বসে আছেন। দু'জনে চুপি চুপি পেছন দিকে গিয়ে জটায় হাত দিয়ে দেখে। কিন্তু সন্ন্যাসীরা নীরব। কিছু বলেন না। প্রশ্রয় পেয়ে সাহস বেড়ে গেল।

একদিন একজন জটা আর একজন লেংটি ধরে দে টান। তারপর টেনে দৌড়। চিরন্তন বালক। এবার সাধুরা বিরক্ত হলেন। ভগবান গাঙ্গুলীকে ডেকে জানালেন তাদের নালিশ। আচার্য ভগবান শিষ্যদের মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে বললেন, সংসারে যে যেমন ব্যবহার করবে অনুরূপ ব্যবহার তাকেও পেতে হবে। অন্যকে দুঃখ দিলে দুঃখ, সুখ দিলে বিনিময়ে সুখ পাবে। এ যেন আয়না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটলে আয়নার মানুষটি তোমাকে ভেংচি কাটবে। হাসি দিলে সে-ও হাসি দিয়ে তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে। তা ছাড়া, আজ যাদের দেখে তোমাদের অদ্ভুত জীব বলে মনে হচ্ছে এরকম অদ্ভুত জীব তোমাদেরও হতে হবে। মাথায় হবে জটা, পরনে লেংটি।

বিস্মিত লোকনাথ মুখ তুলে তাকায়। বলে, আমরা লেংটি পরব কেন? মাথায়ই বা জটা হবে কেন? প্রশ্ন জেগেছে মনে, জেগেছে সমস্যা।

গুরুর কর্তব্য সমস্যার সমাধান। প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া। ভগবান বুঝিয়ে দিলেন তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মসূচী। চোখের সামনে তুলে ধরলেন সন্ন্যাস জীবনের অনুরূপ চিত্র। কিন্তু তাতেও

জিজ্ঞাসার শেষ হল না। সন্ন্যাসীর জীবনই যদি যাপন করতে হয়, তা হলে এঁদের মত ভিক্ষে করে না খেয়ে গৃহাগত অর্থ-সাহায্যে খাওয়া-পড়া কেন? গৃহ যদি ছেড়ে আসা হল তবে আত্মীয়-স্বজনের জ্ঞাতসারে থাকা অবাঞ্ছনীয়।

বালকের যুক্তি বয়স্কজনোচিত। গুরুকে মানতে হল। বুঝলেন অসামান্য এই বালক। ভবিষ্যৎ সফলতার আশায় আনন্দে ভরে উঠল তাঁর বুক। অধীর আবেগে দু'জনকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে বললেন, তাই হবে, বৎস! কাল থেকে শুরু হবে আমাদের অজ্ঞাতবাস।

পরদিন। আবার যাত্রা হল শুরু। কালীঘাট রইল পিছনে পড়ে।

ভগবান নিজে ছিলেন জ্ঞানমার্গাবলম্বী। কর্মমার্গে সিদ্ধি-লাভের চেষ্টা তিনি করেন নি। লোকনাথকে দিয়ে সে পথে সিদ্ধিলাভের আশায় তাকে কর্মমার্গের পথে পরিচালিত করলেন। ভগবান নিজে জ্ঞানমার্গের পথিক হয়ে লোকনাথকে কেন টেনে নিয়ে এলেন কর্মমার্গে? এটা একটা প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের উত্তরে দেখা দেয় দর্শনের অনেক খুঁটিনাটি কথা।

ভারতবর্ষে প্রচলিত ছ'টি দর্শন। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন।

দর্শনের মূল কথা দুঃখ নাশ।

সংসারে সকলেই সুখের প্রত্যাশী। দুঃখকে কেউ চায় না। কিন্তু সুখদুঃখ এমনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে একটিকে চাইলে আর একটি সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়। নিরবচ্ছিন্ন সুখ সংসারে নেই। কিন্তু মানুষ চিরকাল এ অবস্থা মেনে নিতে রাজী নয়। তাই নিরবচ্ছিন্ন সুখের অনুসন্ধানে চলে তার

অভিযান। সুখের এই অনুসন্ধান নানা জন করলেন নানা মতে। এক বিষয়ে সবাই একমত যে, দুঃখকে নাশ করতে পারলেই সুখের সার্বভৌম আধিপত্য হবে। সুতরাং দুঃখ নিবৃত্তি করার উপায় অন্বেষণে সে যুগের মনীষীদের চিন্তাধারা এই ছ'টি দর্শনে সন্নিবেশিত হল। কিন্তু মত ও পথ নিয়ে পরস্পরে পরস্পরে রইল মতানৈক্য। ন্যায় ও বৈশেষিকে ঈশ্বরের স্থান গৌণ। তাদের মতে দুঃখ নাশের সঙ্গে ঈশ্বরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। সাংখ্যে ও পূর্ব-মীমাংসায় ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এরা নিরীশ্বরবাদী। তাঁরা বলেন, যজ্ঞরূপ কর্মই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞের দ্বারা মানুষ লাভ করবে অমরত্ব—জরা মৃত্যুর অতীত।

সাংখ্য বলেছেন, প্রকৃতি পুরুষ চরম দ্বৈত। বিবেকই দুঃখ নাশের একমাত্র উপায় অর্থাৎ বিবেক বা পার্থক্য জ্ঞান দ্বারা বেছে নিতে হবে কোন্‌টা সুখদাতা, কোনটা দুঃখদাতা। স্পষ্টভাবে তিনিও অস্বীকার করেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব। সব কিছু ঘটানোর মূলে প্রকৃতি। প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ। এর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই। পুরুষ বহু ও স্বতন্ত্র। সাংখ্য দর্শন আরও বলেন যে, তত্ত্ব পঁচিশটি। এই পঁচিশটি তত্ত্বের সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারলে জীব অনন্ত দুঃখের হাত থেকে রেহাই পেয়ে কৈবল্য লাভ করতে পারে।

পাতঞ্জল মতে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ কল্পে ঈশ্বর এবং বীতরাগ মহাপুরুষদের ধ্যান করা বিধেয়। কিন্তু সর্বশেষ বলেছেন, 'যথাভিমত ধ্যানর্ধ্বা'। যা খুশী তাই করে চিত্তচাঞ্চল্য নিরোধ করবে। অর্থাৎ ধ্যানটাই মুখ্য, ধ্যানের বস্তু গৌণ।

সর্বশেষ বেদান্ত দর্শন বা উত্তর মীমাংসা। বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মই মুখ্য। বেদান্ত দর্শন জীবকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন কিন্তু ঈশ্বরে বিলীন করে দেননি।

দুঃখ-নিবৃত্তি সম্পর্কে ঈশ্বরের সম্পর্ক অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেকটি দর্শনের মতবাদে অনৈক্য থাকলেও তাদের প্রত্যেকের চিন্তাধারার মৌলিকত্ব, যুক্তিতর্কের সাবলীলতা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু শেষ মীমাংসা করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলতে হয়। এ যেন বিশাল সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দর্শন। সমুদ্রের বিশালত্ব মনকে যতই বিস্ময়ান্বিত করুক, তার ঐ বিপুল পরিধিকে অতিক্রম করে কোন দিনই পর-পারের কিনারা দেখতে পাওয়া যাবে না, —একথা মন মানতে চায় না।

দর্শনের অখণ্ড যুক্তিতর্কের বেড়াজাল ডিঙাতে না পারলেও মনে থেকে যায় একটা অসম্পূর্ণতা, একটা বিরাট অভাববোধ।

এই অসম্পূর্ণতা, এই অভাব বোধকে দূর করেছেন গীতা। গীতা ঈশ্বরবাদরূপ একটি অপূর্ব বস্তুর সংযোগ করে সমস্ত দর্শন শাস্ত্রকে করে তুলেছেন সুখসম্পূর্ণ।

দুঃখ হানির উদ্দেশ্যে গীতা বিবিধ উপায়ের কথা বলেছেন এবং সকল উপায়েরই কেন্দ্রস্থলে আছেন ঈশ্বর।

গীতার অভিপ্রেত যে জ্ঞান. তা তৎ-এর জ্ঞান। সে জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানী সমস্ত প্রাণীতে প্রথমত আপনাকে এবং শেষে ঈশ্বরকে দর্শন করেন। এবং সে জ্ঞানের ফলে জ্ঞানী অন্তে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। গীতার মতে পুরুষ বহু নন, এক। এবং সেই পুরুষ ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন। ঈশ্বরই জীবরূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সাংখ্যের প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু গীতাকারের মতে প্রকৃতির পরিণাম ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের জন্য। ঈশ্বরের অধিষ্ঠানবশতই প্রকৃতি এই বিশ্ব প্রসব করেন।

ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে কৈবল্য লাভের যে কথা সাংখ্য বলেন, গীতা তা স্বীকার করেননি। ঈশ্বরকে লক্ষ্য না করে তাঁর ভাবে ভাবিত না হয়ে এ পথে এক পা-ও অগ্রসর হওয়া যায় না।

যোগী সম্বন্ধে গীতা বলেছেন, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করে যিনি তাঁকে উপাসনা করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।

তাই গীতা যোগের উপদেশ দিয়ে বলেছেন,—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈ ব মাত্মানাং মৎপরায়ণঃ॥

ষড়্‌দর্শনের সমস্যার সমাধান করেছেন গীতাকার ভক্তিবাদ প্রচার করে। সকল মতানৈক্যের সমন্বয় করেছে এই ভক্তি। পণ্ডিতের মনের যে অতৃপ্তি, যে অভাববোধ তা যেন এতদিনে মিটেছে। কূট তর্ক ও বিচারবুদ্ধির বেড়াজাল ডিঙিয়ে সে দেখতে পেয়েছে এমন একটি পথ, যে পথের শেষে আছে পরম সুখময় নিরাপদ আশ্রয়।

ভগবান গাঙ্গুলী অন্তরের এই অভাববোধের তাড়নায় শিষ্যদের নিয়ে এলেন কর্মমার্গের পথে। তাদের শেখাবেন অনাসক্ত কর্মযোগ।

সমস্ত জীবন দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করে ভগবান বুঝেছিলেন যে, এতে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান হয় বটে কিন্তু প্রেম ও ভক্তি বিনা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয় না। তাই নিজের জীবনের এই প্রত্যক্ষ ফল শিষ্যদের ভিতর সংক্রামিত করতে চান নি। লোকনাথের বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাকে দর্শনশাস্ত্রের তর্ক-জালের মধ্যে প্রবিষ্ট না করিয়ে ভক্তি প্রেম দ্বারা পরিপুষ্ট কর্মমার্গে পরিচালিত করলেন এবং তাদের শেখালেন :

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।

তুমি তেজ—তেজ দিয়ে আমাকে পূর্ণ কর।

তুমি বীর্য (মনের শক্তি)—বীর্য দিয়ে আমাকে পূর্ণ কর।

তুমি দেহের বল—দেহেব বল দিয়ে আমাকে পূর্ণ কর।

তুমি জীবনীশক্তি—জীবনীশক্তি দিয়ে আমাকে পূর্ণ কর।

তুমি বীরের সাহস—বীরের সাহস দিয়ে আমাকে পূর্ণ কর।

তুমি সহ্যশক্তি—সহ্যশক্তি দিয়ে আমাকে পূর্ণ কর।

দৈনন্দিন কর্মসূচি আরম্ভ করবার আগে শিষ্যদের নিয়ে বন পবন মুখরিত করে ভগবান গাইলেন—

ওঁ অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়॥

মিথ্যা থেকে আমাকে সত্যের পথে চালিত কর। দূর করে দাও অমানিশার অন্ধকার, টেনে নাও আলোকের পথে। মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে নিয়ে চল প্রভু।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি
ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, কুমার কুমারীরূপে তুমি। বৃদ্ধ সেজে লাঠি ভর দিয়ে তুমিই চল। তুমি জন্মগ্রহণ করে বহু রূপে উপস্থিত হও। তাই—

ওঁ নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়।
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়॥
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তি প্রদায়।
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥

তুমি সৎস্বরূপ, তুমি সকল লোকের আশ্রয়, তুমি চৈতন্যস্বরূপ।

এই বিশ্ব তোমার একটি রূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ছাড়া কিছুই নেই, তুমি সকলকে মুক্তি দাও তুমি সর্বব্যাপী এবং সকল গুণের অতীত ব্রহ্ম, তোমায় নমস্কার।

তদেকং স্মরামস্তদেকং ভজাম
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
তদেকং নিধানং নিরালম্বমীশম্
ভবাম্ভোধিপোতং শরণং ব্রজামঃ॥

হে পরমেশ্বর, তুমি এই জগতের সাক্ষী, আমি একমাত্র তোমারই ধ্যান করছি, তোমারই বন্দনা করছি, একমাত্র তোমাকেই নমস্কার করছি। তুমিই একমাত্র সত্য, তুমিই আমাদের চরম লক্ষ্য, তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন ঈশ্বর। তুমি সংসার সাগরে তরণী স্বরূপ। তুমি শরণাগতের আশ্রয়। আমি তোমার শরণার্থী।

প্রার্থনার পর আরম্ভ হয় দিনের কাজ।

ভগবান জানতেন ব্রহ্মচর্য ও যম নিয়মাদি দ্বারা শরীর পরিপক্ক না হলে যোগসিদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। তাই বনবাসী হয়ে প্রথম থেকেই শিষ্যদের ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করাতে লাগলেন।

ন স্তপস্তপ ইত্যাহ্‌ ব্রহ্মচর্যৎ পরংতপঃ।
উর্ধ্বরেতা ভবেদ যস্ত্ব স দেবো ন তু মানুষঃ।

ব্রহ্মচর্য ব্যতীত যে তপস্যা তা তপস্যার মধ্যে গণ্য নয়। উর্ধ্বরেতা পুরুষ দেবতা সদৃশ। সুতরাং ব্রহ্মচর্যই পরম তপস্যা।

গুরুদেব বটেন ভগবান গাঙুলী। অনুষ্ঠানের ত্রুটিহীন সম্পন্নতায় গুরুর মত কঠোর, জীবনধারণ উপযোগী খাদ্যবস্তু সংগ্রহে পিতার মত কর্তব্যপরায়ণ। আহার্য প্রস্তুত করে পরিবেশনে মায়ের মত স্নেহশীল, সাহচর্য সহৃদতায়, বাৎসল্যে ভ্রাতা ও বন্ধুতুল্য প্রেমময়।

শুধু কি তাই? শিষ্যদের উপবাসক্লিষ্ট দেহে নড়াচড়া সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে এই সম্ভাবনায় মলমূত্রাদি সরিয়ে শৌচাদি পর্যন্ত

নিজ হাতে করিয়ে দিতেন। এমন না হলে গুরু! প্রচলিত রীতির অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম। কত সেবা, কত সাধ্য সাধনা তবু গুরুর সন্তোষ লাভ করা কত কষ্টকর!

গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক। কিন্তু এই লাখ লাখ গুরুর মধ্যে এমন গুরু একটিও মেলে কি? শিষ্যের শিক্ষা সম্পাদনে গুরুর নিঃস্বার্থ এই আত্মপরায়ণতা, আন্তরিক এই প্রচেষ্টা অভিনব। কে জানে জন্মান্তরীণ ঋণ পরিশোধের এটা একটা উদাহরণ কি না?

বনের পথ ধরে চলেছেন তিনটি প্রাণী। সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়। কপর্দকশূন্য। কালীঘাটে থাকা পর্যন্ত বাড়ি থেকে ভরণ-পোষণের জন্য সাহায্য আসত।

কিন্তু বালক লোকনাথ এই ব্যবস্থা সমর্থন করতে পারেন নি। না পারারই কথা। সংসারত্যাগের বাসনা নিয়েই যদি ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে আসে, তাহলে সবরকম সম্পর্কই তার সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। সব রকমে হতে হবে স্বাবলম্বী। কালীঘাটের নিরাপদ আশ্রয়স্থলও কাম্য নয়। লোকনাথ চরিত্রের এই সরলতা তাঁর জন্মগত সংস্কার। তা না হলে একাদশ বর্ষ বয়স্ক বালকের পক্ষে সংসারের মায়া মমতা ত্যাগ করে বেরিয়ে আসা সম্ভব হত না। জহুরী ভগবান চিনতে পেরেছিলেন এই জহরকে, যেমন চিনেছিলেন নরেন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ। তা না হলে ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত সংসার জীবন যাপন করে জীর্ণ তরী ভাসিয়ে দিতেন না এক অকূল ভব সাগরের কিনারা খুঁজে বার করার চেষ্টায়, সঙ্গে নিয়ে দুটি নাবালক শিশু!

পথ ধরে চলেছেন অভিযাত্রী। বিঘ্নসঙ্কুল পথের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে নদীনালা পার হয়ে অমূল্য বস্তুর সন্ধানে। কী সেই বস্তু যার জন্য তুচ্ছ করেছেন মানুষের পরম কাম্য কাম, কাঞ্চন,

সুখ, ভোগ, প্রতিষ্ঠা? দেহের কষ্টকে গ্রাহ্য করেন নি। আহার বিহারে স্বাচ্ছন্দ্যকে করেছেন পরিহার, মায়া-মমতা করে এসেছেন পদদলিত।

সে বস্তু কি? পরমার্থ। যা পেলে সব পাওয়া যায়। যাকে জানলে সব জানা যায়। থাকে না অভাববোধের যন্ত্রণা, পীড়িতের আর্তনাদ, থাকে না জরা-মৃত্যু, শোক-তাপ। এই পরমার্থের সন্ধানে চলেছেন তিনজন। এ রত্ন ত লোকালয়ে মেলে না। মেলে নির্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে। কলকোলাহল বর্জিত পাহাড়ে, নিবিড় কাননে। তাইত চলেছেন লোকালয় ত্যাগ করে। অতীতের হাত ধরে চলেছে ভবিষ্যৎ। জ্ঞানের হাত ধরে কর্ম।

রৌদ্রক্লান্ত পথযাত্রী। পড়ন্ত বেলায় আশ্রয় নিয়েছেন বনের ভিতর পত্রবহুল কোন এক বৃক্ষচ্ছায়ায়। আজকের মত চলা শেষ। গুরু ভগবান বের হলেন আহার্য অন্বেষণে লোকালয়ে।

সমস্ত দিন উপবাস। ব্রহ্মচারীরা পালন করছেন নক্তব্রত। সারাদিনের উপবাসের পর রাত্রের আহার হবিষ্য। গ্রাম থেকে ভগবান সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন কিছু দুধ আর কিছু তিল।

দুধ ও তিল সহযোগে গুরুদেব আহার্য প্রস্তুত করে শিষ্যদের খাওয়ান, নিজেও খান। আহারাদি শেষে শিষ্যদের নিয়ে গুরু বসেন অধ্যাপনায়। এমনি করে চলে দিনের পর দিন। নিজের অধীত বিদ্যা এভাবে সংক্রামিত করেন শিষ্যদের ভিতর। একদিন নয়, দু'দিন নয়, দু'চার বৎসর নয়। ক্রমান্বয়ে ত্রিশ বৎসর চলে এই কর্মসূচী। নিত্য নৈমিত্তিক খাদ্য দুধ আর তিল। ব্রহ্মচারীদের কাছে একঘেয়ে হয়ে ওঠে। মুখে আসে অরুচি।

কিন্তু উপায় নেই। গুরুর নির্দেশ। ব্রহ্মচর্যাবস্থায় এই খাদ্যই প্রশস্ত। শুধু শিষ্যেরা খাচ্ছেন তা নয়। গুরুদেবও এই খাদ্য গ্রহণ করছেন। কি প্রয়োজন ছিল তাঁর এই কৃচ্ছ্রসাধনায়?

নিজের জন্য তিনি অন্য কোন রুচিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু করেন নি। কেন? 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়।' শুধু উপদেশ সারহীন, শক্তিহীন। মুখে বলে শুধু হবে না। আচরণ করে দেখাতে হবে। গুরু-শিষ্য সম্পর্কে এই বিধি চিরন্তন। যেখানে এর ব্যতিক্রম সেখানেই এসেছে বিফলতা। শুধু আধ্যাত্মিক জীবনে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও এর ব্যতিক্রম এনে দেয় চরম অসাফল্য। গুরুর আচরণে এই নিষ্ঠা তাকে করে তুলেছে মহান। সাফল্যের জয়মাল্য হয়েছে করায়ত্ত।

কিন্তু শিষ্যদের কাছ থেকে একদিন এল বিনীত অভিযোগ। এখন তাঁরা আর বালক নন, যুবক। যৌবনোচিত দেহসামর্থ্য নিয়ে বৃদ্ধ গুরুর ভিক্ষালব্ধ অন্ন বসে বসে খাওয়া অসমীচীন—এই অভিযোগ। তাঁদের অনুরোধ, ভিক্ষা করে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে আনবেন তাঁরা পালাক্রমে। গুরুকে এভাবে পরিশ্রম করতে দিতে শিষ্যেরা রাজী নন!

কিন্তু গুরুর সমর্থন পাওয়া গেল না! দৈহিক অসামর্থ্যের কথা অবান্তর। কেননা, বয়স অনেক হলেও দেহে তাঁর জরা আসেনি। গুরুর পরিশ্রম লব্ধ অন্ন গ্রহণে আপত্তির নিরসনকল্পে শুধু এ কথাটাই তাঁদের জানিয়ে দিলেন যে, ব্রহ্মচর্য সাধনে যে একনিষ্ঠতা প্রয়োজন তা তিনি নষ্ট হতে দিতে পারেন না। গৃহস্থদের সংস্পর্শে এলে তাদের বিবিধ ভাবের প্রত্যক্ষতায় চিত্ত বিকার এবং পরিণামে যোগভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট!

শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠান নিয়েই ভগবান নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নি। শিষ্যদের আভ্যন্তরিক অনুষ্ঠানের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর দৃষ্টি। তাঁদের মনে কখন কি ভাবের উদয় হয়, তাও তিনি লক্ষ্য রাখতেন এবং অসৎ সংস্কারে কোন ভাব প্রকাশ পেলে অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে তা সমূলে উৎপাটন করতেন।

এ যেন একটি পুষ্পোদ্যান। ভগবান গুরু তার মালি। শিষ্যদ্বয় দুষ্প্রাপ্য দুটি পুষ্প চারা। নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে এদের বাঁচিয়ে তুলতে হবে—স্নেহরস সিঞ্চিত করে, কঠোর কর্তব্যের সার দিয়ে, কীটপতঙ্গ ও আগাছার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। অপূর্ব শিষ্য-বাৎসল্য। কর্তব্যের প্রতি অপরিসীম নিষ্ঠা। শুধু অভাবনীয় নয়, দুর্লভ।

দণ্ডীর বেশে ফেরে দেশে দেশে।

ভ্রাম্যমাণ ব্রহ্মচারীরা কোন স্থানেই বেশী দিন থাকেন নি। দু'চারদিন একস্থানে অবস্থানের পর বেড়িয়ে পড়েছেন নতুনের সন্ধানে।

এমনিভাবে বহুপথ অতিক্রম করে তাঁরা এলেন গয়াধামে। সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ এই গয়া। অন্যান্য তীর্থে যে ব্যক্তি যায় কিংবা বাস করে, সে নিজে উদ্ধার পায়। কিন্তু গয়াতীর্থ যে করে তার পরলোকগত ছাপান্ন কোটি পুরুষ মুক্ত হয়ে যান।

গয়াতে চৈত্র মাসে মধু গয়া ও ভাদ্র মাসে সিংহ গয়া করার জন্য বহুযাত্রীর সমাগম হয়।

আচার্যদেব শোনালেন শিষ্যদের গয়ার উৎপত্তি।

ত্রিপুরাসুরের পুত্র গয়াসুর। তপস্যা করতেন ব্রহ্মার। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দিলেন বর—গয়াসুরের প্রার্থিত 'অমরত্ব'। গয়াসুর হলেন অমর।

গয়াসুরের পিতা ত্রিপুরাসুরকে বধ করেছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব। পিতৃহন্তার প্রতি পুত্রের আক্রোশ স্বাভাবিক। তাই অমরত্ব পেয়ে গয়াসুর মহাদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মৃত্যুভয়হীন গয়াসুর।

মহাদেব যুদ্ধে হেরে গেলেন। এলেন নারায়ণ। নারায়ণও দুবার যুদ্ধে হেরে গয়াসুরকে দিতে চাইলেন বর।

নারায়ণের কথা শুনে হেসে গয়াসুরও নারায়ণকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হলেন।

সুচতুর নারায়ণ গয়াসুরকে সত্যাবদ্ধ করে এই বর চাইলেন যে, আজ থেকে গয়াসুর পৃথিবী ছেড়ে পাতালে গিয়ে বাস করবে।

'তথাস্তু।'

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ গয়াসুর নিজের ভুল বুঝতে পারলেও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। তবে এই শর্তে যে, গয়াসুর পাতালে গেলে তাঁর মাথার উপর পা দিয়ে নারায়ণকে থাকতে হবে দাঁড়িয়ে এবং লোকে গয়ায় এসে এই শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড দিলে তাদের পিতৃপুরুষেরা উদ্ধার হয়ে বৈকুণ্ঠে বসবাস করবে। কিন্তু যদি কোন দিন দেখা যায় যে, পিণ্ড পড়ে নি, সেদিন তিনি পাতাল থেকে উঠে নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন।

শর্তাবদ্ধ নারায়ণ সেই থেকে আজও দাঁড়িয়ে আছেন গয়াসুরের মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম রেখে। তাই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ এই গয়াধাম।

যে মানে সে মানে, যে শোনে সে শোনে
যে মানে শোনে মজে যে প্রাণ।

বিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শন করে তাঁরা ফল্গু নদীতে স্নান তর্পণ করলেন। দেখলেন প্রেত-শীলা। এখানে পিণ্ড দিলে মৃত ব্যক্তি প্রেতত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে।

দেখলেন বুদ্ধগয়া। এইখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন শাক্যসিংহ। শহরের এক প্রান্তে বুদ্ধ মন্দির। বিরাট মন্দির, বিরাট তার গহ্বর। ভিতরে আসনে উপবিষ্ট সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্তি। দিনেও অন্ধকার, তাই সহস্র ঘি-এর বাতি জ্বলে দিবারাত্রি। সমস্ত ঘুরে দেখে বসলেন এসে অক্ষয় বটের তলে। রাত্রে দৈনন্দিন কর্মসূচীর পুনরাবৃত্তি।

শিষ্য সঙ্গে গুরু ভগবান। শুরু হয় অধ্যাপনা। চমৎকার পরিবেশ। এ যেন সে যুগের আর্য ঋষিদের আশ্রম। আকাশে চাঁদ। চাঁদের আলোয় সৃষ্টি হয়েছে মোহময় পরিবেশের। ঘন-পত্র সন্নিবেশিত বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে আলো আঁধারের লুকোচুরি বাতাস বইছে ধীরে—নাম-না-জানা বনজাত ফুলের গন্ধ বহন করে।

তন্ময় হয়ে শিষ্যেরা শুনছেন। গুরু বলছেন।

অন্তরের দেবত্ব-প্রকাশের একমাত্র উপায় ধর্ম। শাস্ত্র দিয়েছে ধর্মের শিক্ষা। জীবনে যা কিছু শ্রেয় প্রেয় তা পাওয়ার নানা মত, নানা পথের নির্দেশ আছে শাস্ত্রে।

শাস্ত্র অর্থে বেদ, মনুসংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা। সকল মতবাদের সমন্বয় করেছেন গীতা। গীতা বলেছেন আত্মদর্শন। ইশ্বরকে না পেলে মানুষের শান্তি হয় না, স্বস্তি মেলে না। ঈশ্বরত্ব পাওয়ার প্রযত্নই সত্য ও একমাত্র পুরুষার্থ এই আত্মদর্শন। আত্মদর্শনের একমাত্র উপায় কর্মফল ত্যাগ। বলামাত্রই কর্মফল ত্যাগ করা যায় না। এজন্য চাই জ্ঞান। কেবল শুষ্ক পাণ্ডিত্য নয়, এর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে ভক্তি। ভক্তিহীন জ্ঞান বৃথা। এই জ্ঞানভক্তিকে যাচাই করে নিতে হবে, কষে দেখতে হবে কষ্টিপাথরে খাঁটি কিনা।

লৌকিক কল্পনায় শুষ্ক পণ্ডিতও জ্ঞানী বলে গণ্য। তাঁকে কোন কাজ করতে হয় না লোটাটিও তোলে না। পাছে কাজ করলে কর্মবন্ধন হয়। এরূপ যজ্ঞশূন্য ব্যক্তি যেখানে যোগী বলে গণ্য, সেখানে লোটা উঠানোর মত তুচ্ছ লৌকিক ক্রিয়ার স্থান কোথায়? ভক্ত হচ্ছে নিষ্কর্ম—মালা নিয়ে জপকারী। সেবাকর্ম করতে তার মালার বিক্ষেপ আসে। সেজন্য খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি ভোগের কাজের জন্যই সে মালা হাত থেকে রাখতে পারে—যাঁতা চালানোর জন্য বা দরিদ্রের সেবার জন্য কখনও না।

এদের জন্য গীতা বলেছেন—"কর্ম বিনা সিদ্ধি পাওয়া যায় না। জনকাদিও কর্মদ্বারা জ্ঞানী হয়েছেন। যদি আমিও আশারহিত হয়ে কর্ম না করি তবে এই লোকের বিনাশ ঘটবে।"

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

জ্ঞানে অধিষ্ঠিত অনাসক্ত কর্ম করণীয়—তাই যজ্ঞ। যে ব্যক্তি আসক্তি ত্যাগ করেছে, যে মুক্ত, যার চিত্ত জ্ঞানময়, সে যে কর্ম করে তা-ই যজ্ঞ এবং এই কর্ম-যজ্ঞ নিষ্পন্ন করে তার সমস্ত কর্ম লয় পায়।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥

যুদ্ধ কর, জ্ঞানের অসি ধর। জ্ঞান কৃপাণে হৃদয়স্থিত অজ্ঞান সম্ভূত সংশয় নাশ কর।

তথাপি অর্জুনের সংশয় যায় না। শিষ্য অর্জুন প্রশ্ন করেন গুরু শ্রীকৃষ্ণকে। অর্জুনের জ্ঞান-পিপাসা বর্ধিত হয়েছে। তাকে আরও জানতে হবে, আরও বুঝতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের অনেক কথা অর্জুনের কাছে মনে হচ্ছে পরস্পরবিরোধী! বুদ্ধি দিয়ে মীমাংসা করে উঠতে পারছেন না। তাই সংশয়-দোলায়িত মন পরম শ্রদ্ধাসহকারে জানতে চাইছে পথের সন্ধান!

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমাতে পরায়ণ হয়ে আত্মাকে আমার সঙ্গে যুক্ত করলে আমাকে পাবে।

এরপর ভগবান বিভূতি বর্ণনা করলেন। অর্জুনের অনুসন্ধিৎসা পুনরায় জাগ্রত হল। অর্জুন এতক্ষণ ভগবানকে দেখছিলেন দূরে, এখন দেখছেন পূর্ণ ব্রহ্মরূপে। তাই জিজ্ঞাসা করছেন,

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া॥

হে প্রভু তোমাকে কিরূপে চিন্তা করব ?

"আছ অনলে অনিলে চির নভোনীলে
ভূধরে সলিলে গহনে।
আছ বিটপী লতায় জলদের গায়
শশী তারকায় তপনে ॥"

আমাকে বলে দাও প্রভু কি নামে তোমাকে ডাকব!

ভক্তের ঐকান্তিক আগ্রহে ভগবান দেখালেন বিশ্বরূপ। বিস্ময়ে ভক্তিতে অভিভূত অর্জুন। সকল যুক্তিতর্কের অবসান ঘটিয়ে ভগবান জানালেন ভক্তির পথই শ্রেষ্ঠ। শুধু জ্ঞান দিয়ে আমাকে পাবে না, তার সঙ্গে চাই ভক্তি। আমাকে যদি একান্ত করে পেতে হয় তা হলে :

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

জ্ঞান, বুদ্ধির অহঙ্কার ত্যাগ করে আমার শরণ লও। আমি তোমায় সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করব।

অর্জুনের জ্ঞানের মোহ, বুদ্ধির মোহ লোপ পেয়েছে। তার শুভ চেতনা জাগ্রত, তাই সকল সংশয়ের শেষ করে ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে বলছেন।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

আমার মোহ নষ্ট হয়েছে। তোমার করুণায় আমার চেতনা এসেছে। সংশয়ের সমাধান হওয়ায় আমি আত্মস্থ-হয়েছি। ভগবান, তোমার উপদেশ অনুযায়ী কাজ করব।

গুরু ভগবানের কণ্ঠ কেঁপে ওঠে। শিষ্যদের উপলক্ষ করে নিজেকেই তিনি এভাবে একথা বোঝাতে চান কিনা কে জানে ?

গয়া ছেড়ে এলেন কাশী। পুণ্যতীর্থস্থান, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

কাশী-বিশ্বনাথ। কাশীর পাশ দিয়ে প্রবাহিতা উত্তরবাহিনী গঙ্গা। গঙ্গায় স্নান মহা পূণ্যের কাজ। তিনজনে গঙ্গায় কাশীর নেমে হাতে জল নিয়ে সপ্তনদীকে আহ্বান জানালেন,

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু ॥

সপ্তনদী প্রবাহিতা ভারতের একখানা মানচিত্র। আসমুদ্র-হিমাচল অখণ্ড ভারতের নিদর্শন! জাতিধর্মনির্বিশেষে এক-প্রাণতার অপূর্ব আবেদন!

মণিকর্ণিকার ঘাট। কাশীর মহাশ্মশান। ভগবান বলছেন, এক সময় বিষ্ণু চক্রদ্বারা এক পুষ্করিণী খনন করে নিজের গাত্র স্বেদ দ্বারা পূর্ণ করলেন এবং তীরে বসে পাঁচ হাজার বছর মহাদেবের ধ্যান করলেন। বিষ্ণুর এই ঘোর তপস্যায় শিবের শির কেঁপে উঠে কান থেকে খসে পড়ল কর্ণভূষণ। সেই হতে এর নাম হয়েছে মণিকর্ণিকা।

পরে গঙ্গা এসে এই পুষ্করিণীর সঙ্গে মিলিত হয়। এই ঘাটের কাছেই শশ্মানে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র শব আগলাতেন। পৌরাণিক যুগের কথা।

বিশ্বামিত্রকে প্রতিশ্রুতি মত সর্বস্বদান করে রাজা হলেন ভিখারী। কিন্তু দক্ষিণা ব্যতীত দান অসম্পূর্ণ। বিশ্বামিত্র চাইলেন দক্ষিণা। কিন্তু অর্থ নেই। সত্যাশ্রয়ী রাজা দক্ষিণার অভাবে দানের ত্রুটি রাখতে পারেন না। তাই কাশীর বাজারে মেয়ে, স্বামী, স্ত্রী হলেন বিক্রীত—সেকালের প্রথানুযায়ী। বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দক্ষিণা রূপে দান করে সর্বস্ব দানের গৌরবকে ত্রুটিহীন করলেন। রানী শৈব্যা পুত্র রোহিতাশ্বকে নিয়ে হলেন এক ব্রাহ্মণের দাসী। মহারাজ হলেন চণ্ডালের ক্রীতদাস—শ্মশানে মরা আগলানোর প্রহরী।

তারপর !

শৈব্যা ব্রাহ্মণের সংসারে সব কাজ করেন। আর রোজ ভোরে উঠে রোহিতাশ্ব ব্রাহ্মণের পূজার ফুল সংগ্রহ করে।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডালের বেশ, চণ্ডালের আচরণ। দিবারাত্র শ্মশানে দিচ্ছেন পাহারা, পাছে না কেউ বিনা কড়িতে শব দাহ করে। পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে করছেন শ্মশান প্রহরীর কাজ—পূর্বসংস্কার মুক্ত হয়ে। কোথায় স্ত্রী শৈব্যা, কোথায় পুত্র রোহিতাশ্ব ? কোথায়ই বা অযোধ্যার রাজ্যপাট ?

দিন যায়। তারপর দুর্যোগের এক অমানিশা। ঝঞ্ঝা-অশনিপাতে প্রকৃতির প্রলয় নাচন। মহাকালের রুদ্ররোষে সৃষ্টি আজ রসাতলে যাবার উপক্রম। নগরের রাজপথে নেই জনপ্রাণীর সাড়া। নিশাচর হিংস্র প্রাণী ছুটাছুটি করছে প্রাণভয়ে, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

এমনি ভয়াবহ রাত্রির বিপদ তুচ্ছ করে নগরের রাজপথ ধরে চলেছে এক নারী শ্মশানের উদ্দেশ্যে। বুকে জড়িয়ে নিয়েছে নিজের বস্ত্রাচ্ছাদিত এক শব, দুর্যোগের এই তাণ্ডব লীলার ভিতর শ্মশান প্রহরীর অনুপস্থিতির সুযোগের সন্ধানে। দরিদ্র রমণী শ্মশানের কড়ি দেবে কোথা থেকে ?

কাশীর মহাশ্মশান। সূচীভেদ্য অন্ধকার। শ্মশানের স্তব্ধতা তাতে আরও কঠিন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। প্রাণের কোন সাড়া নেই সেখানে, শুধু গঙ্গার কুল কুল শব্দ ছাড়া। নির্বাণোন্মুখ কোন চিতার ক্ষীণ আলো বাতাসে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, তারই আলোকে পথ দেখে নিয়ে নারী মূর্তি শ্মশানে এসে উপস্থিত হল। বস্ত্রাচ্ছাদিত শব বুকের কাছ থেকে আলগা করে চিতার আগুনের আলোকে শেষবারের মত মুখখানা দেখার জন্য আচ্ছাদন

সরিয়ে চেয়ে রইল মুখের দিকে। পুঞ্জীভূত শোক নিষেধের বাধা মানল না। কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল করুণ আর্তনাদ।

—বাপ রে আমার, বাছা রে আমার ?

—কৌন হ্যায় ?

কঠিন হুঙ্কারে স্তব্ধ হয়ে গেল করুণ আর্তনাদ। আতঙ্কে কেঁপে উঠল রমণীর বুক। এত বড় দুর্যোগেও চণ্ডাল ভোলেনি তার কর্তব্য। কঠিন-প্রাণ এই চণ্ডালের কাছে কপর্দকহীনার সকল আবেদনই বুঝি হবে নিষ্ফল ?

হুঙ্কার যেন মূর্তি ধরে এসে উপস্থিত হল। অভিনব বেশ। বংশদণ্ড হাতে যমকিংকরের কদর্যতা। কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল :

—ফাঁকি দিয়ে মরা পোড়াতে এসেছ ?

—ফাঁকি নয় অক্ষমতা !

রমণীর কণ্ঠ কেঁপে ওঠে। বুকের রক্ত হয়ে আসে হিম-শীতল।

—কোন্ ভোরে বাছাকে আমার সাপে কেটেছে, কিন্তু সারা দিনে কারো কাছেও শ্মশানের কড়ি সংগ্রহ করতে পারিনি। তাই নিয়েছি লুকোচুরির আশ্রয়। দয়া কর, সন্তানের শেষ কাজটির জন্য অনুমতি দাও।

চণ্ডালের বুক কেঁপে ওঠে নারীর করুণ আবেদন। কতদূর থেকে ভেসে আসে হারানো একটা সুর। খসে পড়তে চায় চণ্ডালের আবরণ, মুহূর্তের জন্য মনে জাগে কর্তব্যচ্যুতি। কিন্তু মুহূর্তের জন্যই। প্রতিদিন কত নারীর কান্না, কত আকুল আবেদন তাকে শুনতে হয়। নূতন কিছু নয় ! তবে কাতররোলে কেঁপে উঠবে কেন চণ্ডালের মন ? তাই কণ্ঠস্বর আরো রুক্ষ করে বলল : দয়া-দাক্ষিণ্যের স্থান শ্মশান নয়। বিনা শুল্কে মৃত দাহ হবে না।

নিরুপায়ের বেদনায় কেঁদে উঠল অভাগিনী রমণী।

—বাবা রোহিতাশ্ব—

রোহিতাশ্ব!

একি, কাশীতে ভূমিকম্প? পায়ের তলা থেকে যেন পৃথিবী সরে যাচ্ছে, হাত থেকে খসে পড়ে গেল বংশদণ্ড। সহসা আকাশে বিদ্যুৎ চমকে গেল।

খানিক আলোকে দেখা গেল শোকাভিভূতা নারী বসে আছে মৃত পুত্র কোলে নিয়ে।

স্মৃতির দুয়ার থেকে খুলে গেল যবনিকা। ভেসে উঠল অতীতের স্মৃতি, পূর্বসংস্কার ফিরে এল মনে। কণ্ঠে এল মানবের কাতরতা।

—নারী তুমি কে?

—আমি শৈব্যা।

—শৈব্যা? বিদ্যুৎ! আর একবার! আর একবার জ্বলে উঠে নিরসন কর আমার সন্দেহ।

স্বর্গের দেবতার কানে পৌঁছালো এই আবেদন। অন্ধকার আকাশ ভেদ করে জ্বলে উঠল বিদ্যুতের আলো। তারপর মহাশ্মশানের বুকে মহামিলনের ছবি।

বিশ্বামিত্রের আশীর্বাদে পুত্র রোহিতাশ্ব বেঁচে উঠল। সত্য পালনের পুরস্কারে হরিশ্চন্দ্র ফিরে পেলেন রাজ্যপাট। দুঃখের অবসানে সুখের দিন সমাগত।

পুরাণের কাহিনী! এর কতটা সত্য আর কতটা কল্পনা সে বিচারের ভার ঐতিহাসিকের। কিন্তু সত্যের জন্য, আদর্শের জন্য ত্যাগের এ রকম দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে কম নেই।

বিশ্বনাথের মন্দির।

ভক্ত পূজারীদের সমাগমে নাটমন্দির পরিপূর্ণ। আরতির দৃশ্য চমৎকার। সদ্যোস্নাত আটজন ব্রাহ্মণ গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে পঞ্চপ্রদীপ। নানা মুদ্রাসহকারে বিশ্বনাথের আরতিতে মগ্ন, কণ্ঠে স্তবগান। দর্শকদের ভিতর অনেকে বাদ্যের তালে তালে নৃত্যরত।

চলতি প্রবাদ, শিবের মন্দির তৈরি করেছেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই তৈরি এই মন্দির। রানী অহল্যাবাই এই মন্দির নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করেছেন। মন্দিরের উপরটা সম্পূর্ণ সোনার পাতে মোড়া। রণজিৎ সিংহের কীর্তি এটি।

অন্নপূর্ণার মন্দির।

দেবী অন্নপূর্ণা দুর্গার আর এক নাম। সমস্ত দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত। শুধু স্বর্ণময় মুখখানা খোলা। দেবীর এক হাতে হাতা, আর এক হাতে থালা। বিশ্ববাসীর অন্ন পরিবেশনের ভার নিয়েছেন স্বহস্তে।

শিবের পুরাতন মন্দির।

ইতিহাসের কলঙ্ক। হিন্দুর কাপুরুষতার অপমানজনক নিদর্শন। দেবতার শুচিতা, ধর্মের মর্যাদা, জাতির গৌরব রক্ষা করতে না পারার দুরপনেয় গ্লানি। আওরঙ্গজেব মন্দির ভেঙে করলেন মসজিদ।

কাশী নির্মাণ সম্পর্কে প্রচলিত উপাখ্যান।

মহাপ্রলয়ের পর নারায়ণ বটপত্রে শয়ন করে জলে ভাসতে থাকেন। ভাসতে ভাসতে তাঁর পুনরায় পৃথিবী সৃষ্টির অভিলাষ হলে দক্ষিণ অঙ্গ থেকে শিব এবং বাম অঙ্গ থেকে অন্নপূর্ণা আবির্ভূতা হন। আবির্ভাবের পর উভয়ে স্থির করলেন যে, এমন দেশ তাঁরা নির্মাণ করবেন যে, মনুষ্য, পক্ষপক্ষী যে কেউ যে কোন পাপ করে এখানে মারা গেলে মুক্তিলাভ করবে। এই মনস্থ করে তাঁরা নির্মাণ করলেন কাশী।

কাশী ছেড়ে এলেন বৃন্দাবন। বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। তারপর মথুরা। কংসের রাজধানী। অত্যাচারী রাজা কংসের পাপ পূর্ণ হলে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করে হলেন মথুরার রাজা।

মথুরার পর হরিদ্বার। হরিদ্বার স্বর্গের দ্বারস্বরূপ.

ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট গঙ্গা মর্ত্যে আগমন করেন। এখানেই তাঁর প্রথম অবতরণ। সেজন্য বার বৎসর অন্তর এখানে মেলা হয়। এই মেলার নাম কুম্ভমেলা। মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন কুম্ভযোগে স্নান করার জন্য বহু দেশ থেকে বহু যাত্রী, সাধু সন্ন্যাসী, দণ্ডী মোহন্ত, পরমহংস, অবধুত, শাক্ত, শৈব, নাগা, রামায়াৎগণ এসে থাকেন। অনেক রাজা রাজারাও দান-ধ্যান করে পুণ্য অর্জন করতে আসেন।

যাত্রীরা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে। এই ব্রহ্মকুণ্ডের প্রকৃত নাম মায়াপুরী। এর অধীশ্বর ছিলেন দক্ষ প্রজাপতি। মায়াপুরীর পূর্বে নীলপর্বত, পশ্চিমে বিল্বকেশ্বর, উত্তরে লক্ষ্মণঝোলা, দক্ষিণে পিছোড়নাথ।

দক্ষ প্রজাপতি শিবের প্রতি আক্রোশবশত শিবহীন যজ্ঞ আরম্ভ করেন। যজ্ঞস্থলে শিবের অজস্র নিন্দা করেন। দক্ষ দুহিতা সতী শিবের স্ত্রী। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দুঃখে, অভিমানে সতী প্রাণত্যাগ করেন। আদর্শ পত্নী চরিত্র।

আত্মভোলা দেবতা শিবের রোষবহ্নি জ্বলে উঠল। শুরু হল প্রলয় নাচন। দক্ষের যজ্ঞ ভঙ্গ করলেন। দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করে তাতে বসালেন অজ-মুণ্ড। তারপর বের হলেন প্রিয় পত্নীর মৃত-দেহ কাঁধে করে পৃথিবী পরিক্রমায়। উন্মাদের বেশ, পত্নী বিরহে কাতর শোকাচ্ছন্ন দেবতা।

কে বলে হিন্দুর পুরাণের কথা দেবদেবীর কাহিনী? এ যে পৃথিবীর মানুষের মর্মকথা। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ইতিবৃত্ত। রক্ত মাংস দেহের হৃৎস্পন্দন।

স্বর্গের দেবতাদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। প্রলয়ের অধীশ্বর যদি আপন ভুলে পত্নী বিরহে কাতর হয়ে বেড়ান তা হলে সৃষ্টি থাকে না। তাঁরা নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন। নারায়ণ তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে

সতীর দেহ খণ্ডবিখণ্ড করে নানা দিকে ছড়িয়ে দিলেন। দেহের যে অংশ যেখানে পড়েছে সেটি হয়ে উঠেছে পীঠস্থান।

এমনি করে শিষ্যদের নিয়ে ব্রহ্মচর্য অবস্থায় ভগবান নানা তীর্থস্থান ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর একবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন শাস্ত্রের বিধান। এবার দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে অনেকদিন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কথা ভাবছেন ভগবান। অবশ্য শিষ্যদের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন কিছু নেই। তিনি যা আদেশ করবেন নির্বিবাদে তারা তা মেনে নেবে এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তাই তিনি মনস্থির করলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন এক শুভদিনের প্রত্যাশায়।

আজ সেই শুভদিন। বিশাল বনানীর অভ্যন্তরে বৃক্ষতলের মৃৎশয্যা ত্যাগ করে গুরু গাইছেন

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিঃ রাহু-কেতুঃ
কুর্বন্তু সর্বে মম সুপ্রভাতম্॥

গুরুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে শিষ্যেরাও স্তব পাঠ করে শয্যাত্যাগ করলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে গুরু জানালেন তাঁর মনোভিলাষ। যাত্রা হল শুরু! নিরুদ্দেশের নয়। গৃহে ফিরে যাওয়ার।

বহু বছর পর গৃহে ফিরে চলেছেন গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারীরা। গৃহবাসী হতে নয়, গৃহকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে আসবে বলে।

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। তিনের সমাবেশ। ধীরে ধীরে চলেছেন পথ বেয়ে। বহুদূরে পাহাড়ের শীর্ষ দেশে নীল বনানীর শোভা। গাঢ় একটা রেখা টেনে আকাশের নীল থেকে পৃথক করে দিয়েছে। জবাকুসুমসঙ্কাশ প্রভাত-সূর্য কিরণোজ্জ্বল। গিরিশৃঙ্গ

রক্তরাঙা। বনের হরিণ চেয়ে আছে উর্ধ্বমুখে, তার মুগ্ধ দৃষ্টি তুলে। পাহাড়ের গায়ে চরে বেড়াচ্ছে শুভ্রদেহ ভেড়ার দল। সদ্য জাগ্রত পাখির কলকণ্ঠে মুখরিত হয়ে উঠেছে পথের দু'পাশের বন-জঙ্গল। সবার ভেতর পড়ে গেছে জাগরণের সাড়া। উপলখণ্ড অবলম্বন করে কলরোলে নেমে আসছে পাহাড়িয়া ঝরণা। বাতাসে ভেসে আসছে বন্য-জাত নানাজাতীয় ফুলের মিশ্রিত সুবাস। অপূর্ব পরিবেশে অপূর্ব তিন যাত্রী।

পথ চলতে মাঝে মাঝে দু' একটি জনপদের সাক্ষাৎ মেলে। গ্রামবাসীদের ভিতর কর্ম কোলাহলের সাড়া এখনও পড়েনি। সবে মাত্র জেগে উঠেছে। পথে দু' এক জনের সঙ্গে দেখা হতে—'গোড় লাগি বাবা'—বলে তারা অভিনন্দন জানিয়ে চলে যাচ্ছে নিজের কাজে।

শরৎকালের বেলা—স্বল্প তার আয়ু। এই স্বল্প অবসরে অনেকখানি পথ এগিয়ে যেতে হবে। রাতের প্রথম প্রহরে পথ চলা যাবে না, কারণ কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। প্রথম দিকটা অন্ধকার। অজানা পথে পথ হারাবার সম্ভাবনা। এত উদ্দেশ্যহীন চলা নয়। এবারকার গন্তব্য নির্দিষ্ট, সুতরাং যত্রতত্র পথে চলা চলবে না। দিগ্‌নির্দেশ করে চলতে হবে।

লোকালয়ে থাকার এখন আর বাধা নেই। কেননা ব্রহ্মচর্যের প্রথম অবস্থায় লোকালয়ে যাওয়া চলত না। তখন গুরুদেব তাঁদের নির্দিষ্ট এক স্থানে বসিয়ে রাখতেন। নড়াচড়া নিষেধ ছিল। কিন্তু এখন চলছে তার বিপরীত ব্যবস্থা। এখন যেখানে লোক সমাগম হয় সেখানে নিয়েই সবরকম অবস্থার ভেতর দিয়ে গুরুদেব তাঁদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন।

প্রথম প্রথম জনকোলাহলে ব্রহ্মচারীদের মনঃসংযমের ব্যাঘাত ঘটত। কিন্তু অভ্যাসে সব হয়। অভ্যাসই যোগ। এখন আর কোন অসুবিধা নেই। তা ছাড়া, শাস্ত্রীয় অনুমোদনও রয়েছে।

সুতরাং চলার পথে কোন গৃহস্থ বাড়ি আশ্রয় নিতে এখন আর কোন বাধা-নিষেধ নেই। তথাপি তাঁরা নিতান্ত প্রয়োজন না হলে সে রকম ব্যবস্থা করতে ইচ্ছুক নন।

গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ। মাঠের ভিতর দিয়ে চলাচলের কোন বাঁধানো রাস্তা নেই। ক্ষেতের আল ঘুরে শস্যহীন ক্ষেতের ভিতর দিয়ে শুধু দিক লক্ষ্য করে চলেছেন।

ব্রহ্মচারীরা নক্তব্রতের পর একান্তরা অর্থাৎ একদিন সম্পূর্ণ উপবাসী থেকে পরদিন আহার করতেন। একান্তরার পর ত্রিরাত্র— তিনদিন উপবাসের পর রাত্রে আহার। এমনি পঞ্চাহ, নবরাত্র উপবাস ব্রত উদযাপন করে সাফল্যের সঙ্গে তা সম্পন্ন করেছেন। এমন কি, একমাস পর্যন্ত উপবাসী থাকাও অভ্যাস করেছেন। দীর্ঘ-দিনের এই উপবাস লোকনাথ করেছেন দু'বার, বেণীমাধব একবার করেছিলেন। এমনি করে দেশ পর্যটনের সঙ্গে সঙ্গে উপবাসের ব্রত উদযাপন করে ক্ষুধাকে করেছেন জয়। শুধু ক্ষুধা জয় করিয়েই গুরু ভগবান ক্ষান্ত হন নি। মশা ও পিপীলিকার দংশন জ্বালাও সহ্য করিয়ে নিয়েছেন। তখন তাঁদের গুরুদেব একস্থানে বসিয়ে রেখে যোগাভ্যাস করতে দিতেন। নড়ে বসার আদেশ ছিল না। একদিন পিঁপড়ের কামড় অসহ্য হওয়ায় গুরুদেবকে জানালেন লোকনাথ তাঁর অস্বস্তির কথা। গুরু কোন কথা বললেন না।

পরদিন লোকনাথ আসনে চোখ বুজে বসে আছেন। হঠাৎ সাড়া পেয়ে চোখ মেলে গুরুর কীর্তি দেখে অবাক। চারিদিকে চিনি বিছিয়ে তিনি আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন পিপীলিকা বাহিনীকে। লোকনাথ বুঝলেন গুরুর মনোভিলাষ। পিপীলিকার দংশন সহ্য করেও করতে হবে চিত্ত স্থির। যে কোনো অবস্থায় মন থাকবে অচঞ্চল। গুরুগত প্রাণ শিষ্য। তিনি প্রস্তুত। গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য পিপীলিকার দংশন জ্বালাও সহ্য করে নিজ কর্মে মনো-

নিবেশ করলেন। দুষ্প্রাপ্য কোন বস্তু পেতে হলে তার জন্য যে কঠিন মূল্য প্রয়োজন ব্রহ্মচারীরা সাধন অবস্থায় তা দিয়েছেন।

বেলা গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্ণ। যাত্রীদের চলার বিরাম নেই। না আছে আহার্য সংগ্রহের আগ্রহ, না আছে বসে জিরিয়ে নেবার ইচ্ছা।

চলার গতি অবিরাম।

মাসের পর মাস চলল তাঁদের পথ চলা। কত দেশ, কত নগর, কত নদী, কত প্রান্তর অতিক্রম করে একদিন নিশাবসানে এসে পা দিলেন বাংলার মাটিতে।

সেই পথ কিন্তু কত পরিবর্তন! যেখানে ছিল গভীর বন, সেখানে বসেছে নগর। হিংস্র শ্বাপদের আশ্রয়স্থল ভেঙে গিয়ে হয়েছে লোকালয়। কত সুন্দর বাড়িঘর। পথ ঘাট কত উন্নত। পথ চলতে শ্রান্ত পথিকের বিশ্রামের জন্য রাস্তার মাঝে মাঝে যে চটিগুলি ছিল তা এখনও রয়েছে। পথের দুপাশে বড় বড় গাছগুলো এখনও চন্দ্রাতপের মত আকাশ ঢেকে রেখেছে, রৌদ্রক্লিষ্ট পথিককে করছে ছায়াশীতল।

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলা দেশ। মাঠে মাঠে ধান, গাছে গাছে ফল ফুল, খাল বিল নদী জলে ভরা। প্রকৃতি মনো-মুগ্ধকর সবুজ বসনাঞ্চল বিছিয়ে রেখেছে সমস্ত দেশটা জুড়ে।

—মাতার কণ্ঠে শেফালী মাল্য
গন্ধে ভরেছে অবনী।

প্রভাতী কাঁশর ঘণ্টার আওয়াজ দিকে দিকে। চারিদিকে আগমনীর সুর। চমৎকার পরিবেশ, অপূর্ব অনুভূতি। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর অন্তরে প্রাকৃতিক এই শোভা, এই সৌন্দর্য, এই পরিবেশ আনন্দের পরশ দিয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই আনন্দ ঘরমুখী প্রবাসীর আনন্দ নয়। যেমন কবির মুখ থেকে বেরিয়েছে—

"কত তীর্থ ঘুরিলাম সর্বতীর্থসার
তাই মা তোমার কাছে এসেছি আবার।"

নয় গৃহীর মত জননী জন্মভূমির স্নেহাঞ্চল স্পর্শের আকুতি।

দেশকালের অতীত যে মন সে কি মাতৃভূমির কোন আবেদনে সাড়া দেয়? কে জানে?

গতিরুদ্ধ হল। চলার ছন্দ গেল কেটে। সামনে দামোদর। নদী নয়, নদ।

ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে বের হয়ে বাংলার রাঢ়-ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত। খুব ছোট কিন্তু পরাক্রমে কোন বড়র চাইতে হীন নয়। বহু গিরিনিঃসৃত স্রোতধারা এসে পড়েছে দামোদরে। বর্ষার প্রবল ধারায় পুষ্ট হয়ে চলার পথে এসে মিলিত বরাকরের জলসম্ভারে স্ফীত দামোদর! কূলপ্লাবী ধ্বংসলীলায় উদ্দাম হয়ে ওঠে। খামখেয়ালী দামোদর। ধ্বংসের লীলায় তার অবদান অসামান্য! কিন্তু বর্ষার প্রবল পরাক্রান্ত এই নদী শরৎ-কাল থেকে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত ক্ষীণ-ধারায় বইতে থাকে। দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না যে, এরই দুর্দম অত্যাচারে মানুষের প্রাণে জেগে ওঠে অসহায়ের আর্তনাদ।

কিন্তু আজ আর নদের সে রূপ নেই। সে বিগত যৌবন পরা-ক্রমহীন বিস্তীর্ণ বালুকার ভিতর দিয়ে ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত। এরই পারে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ লোকনাথের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে একখানা ছবি। জীবন্ত—যেন আধ-ঘুম আধ-জাগরণে দেখছে একটি স্বপ্ন।

এই দামোদর নদের তীরে একটি গ্রাম, নাম তার 'বেড়ু'। বহু-জাতির বাস। গ্রামের সকলেই সমৃদ্ধশালী নয়, কিন্তু খেয়ে-পরে আছে সকলেই। বর্ধমান জেলা ধানের জন্য প্রসিদ্ধ। সুতরাং

ভাতের কষ্ট গ্রামবাসীদের নেই। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সবাই সুখী। পরস্পরের ভেতর নেই ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতা, ধর্ম নিয়ে নেই ঝগড়া। অল্পবিস্তর সকলকে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। কেউ খাটে নিজের ক্ষেতে মজুর, কেউ মজুর খাটায়। সবাই খাটছে। বসে কেউ নেই। কৃষিপ্রধান দেশ, তাই সকলেরই উপজীবিকা কৃষিকাজ।

ছোট বড় সকলের বাড়ির সামনে ধানের গোলা। লক্ষ্মীর দু'হাত তুলে দেওয়া আশীর্বাদ সোনার ধান হয়ে ভরে ওঠে। গোয়ালে বুধি-মঙ্গলাদের দেওয়া দুধ, পুকুরে মাছ। বাঙালীর খাদ্য তালিকার অপূর্ণতা নেই।

গ্রামের এক প্রান্তে বাস করে তাঁতি। মেয়ে-পুরুষে তারা কাজ করে। ভোর হতে না হতে আওয়াজ ভেসে আসে খটাখট্, খটাখট্। মেয়েরা দেয় টানা, ছেলেরা বসে বোনে। গাঁয়ের চাহিদা এরাই মেটায়। মাটির বাসনের ছড়াছড়ি কুমোরপাড়ায়। কত রং বেরং-এর হাঁড়ি, কলসী। বিশ্বকর্মার মত বসে বসে তৈরি করে কুমোর ভাই, পশুপাখি ঠাকুর দেবতার মূর্তি। তুলি হাতে নিয়ে রং লাগায় মেয়েরা। কুমোরের চাকা ঘোরে দিন রাত। চৈত্র সংক্রান্তির দিন গাজনের মেলায় নিয়ে তুলতে হবে বেসাতি।

ঠিন্ ঠন্ ঠিন্ ঠন্ রাতের নীরবতার ভিতর জেগে থাকে একটি শব্দ—অনেক রাত অবধি। নির্জন গ্রামকে সচকিত করে রাখে। আবার শুরু হয় রাত্রি প্রভাত হওয়ার অনেক আগে। কর্মকার তৈরি করে গাঁয়ের প্রয়োজনীয় দা, কাস্তে, কোদাল, খন্তা, কুড়োল, লাঙল। ধানের বিনিময়ে কাপড়, কাপড়ের বিনিময়ে কুড়োল, খন্তা। শুধু বিনিময়। যার যেটা প্রয়োজন সেই অনুসারে চলে আদান-প্রদান।

শুধু এরাই নয়। গ্রামে আছে গোয়ালা, জেলে, ধোপা, নাপিত

বাগদী, মুচি। সমাজদেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গ—কেউ মাথা, কেউ হাত, কেউ বা পা। হাটে-বাজারে হয় মেলামেশা আদান-প্রদান, শুধু বস্তুর নয় ভাবেরও।

গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে হয় কথকথা, যাত্রা, কবি, পাঁচালী—যা লোক-শিক্ষার বাহন। গাঁয়ের ছোট বড় সকলের উপস্থিতিতে ভরে ওঠে আসর। সকলে রাত জেগে আনন্দের সঙ্গে সঞ্চয় করে মনের খোরাক। শুনে শুনে শেখা হয়ে যায় রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক নানা কাহিনী।

মুখে মুখে আলোচনা করে দর্শনের কত কথা। বাউল ভিখিরী একতারা বাজিয়ে গাঁয়ের পথ দিয়ে গেয়ে যায়ঃ

এ মায়া প্রপঞ্চময়।
ভবের রঙ্গ-মঞ্চ মাঝে
রঙ্গের নট-নটবর হরি
যারে যা সাজান, সে তাই সাজে।

অন্যের তুলনায় সম্পদে যে হীন, মনের কোণে থাকে হয়ত রিক্ততার বেদনা। এই গান শুনে আর থাকেনা দুঃখ। সান্ত্বনায় মন ভরে ওঠে।

রঙ্গমঞ্চের কর্তা হরি। যার যে রকম সাজে তাকে সেই ভাবেই তিনি সাজিয়েছেন। মানুষের ত কোন হাত নেই। যাঁর সৃষ্টি এই জগৎ তিনি যদি তাঁর ইচ্ছামত সাজিয়ে নেন, তাহলে বলবার কার কি আছে!

বাউল গাইছেঃ

কর্মক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াসূত্রে সবই গাথা,
কেহ পুত্র, কেহ মিত্র, কেহ ভার্যা, কেহ ভ্রাতা।
কেহ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা,
কত রঙ্গের অভিনেতা আছেন সেজে কত সাজে।

এই সংসার কর্মক্ষেত্র। কর্ম সম্পাদনের জন্য নানা জনে এসেছে নানা কাজের ভার নিয়ে। এ কর্মের জন্যই পরস্পরের মধ্যে যেটুকু সম্পর্ক।

গানের কথা ফুরোয় না।

যখন যার হতেছে সাঙ্গ এ রঙ্গভূমির অভিনয়,
কা কস্য পরিবেদনা তখন সে কারো নয়।
কোথা রয় প্রেয়সীর প্রণয় পুত্রকন্যার কাতর বিনয়,
শোনে না কারো অনুনয় চলে যায় সাজসজ্জা ত্যজে।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রের যার যখন কাজ শেষ হয়ে যায় তখন আর সে থাকে না। সে চলে যায় এখানকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে, রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার মত। যে অংশটুকু তার অভিনয় করার প্রয়োজন ছিল, তা শেষ হয়েছে। এখন তার এই রাজার সাজ মিথ্যা। রাত জেগে বসে মিথ্যা এই সাজের বোঝা বয়ে লাভ কি? তাই সাজসজ্জা ফেলে ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে যায়। কে বা ছিল অভিনয়ের এই স্বল্প সময়ের জন্য তার জীবনসঙ্গিনী, কে বা ছিল তার পুত্রকন্যা, অভিনয় শেষে সকলেই গৃহে ফেরার তাগিদে ব্যস্ত। কে কার খোঁজ খবর রাখে?

কথাটা সত্যি। কিন্তু মন মানে না। সে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, স্বল্প সময়ের স্বল্প পরিচয়ের আপনজনদের। এই আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তির জন্যই তাকে আসতে হয় পুনঃপুনঃ। মায়া মুগ্ধ-মানব বোঝে না এই আসা যাওয়ার যন্ত্রণা—জন্ম মৃত্যুর অসহ্য জ্বালা। তাই সঙ্গীত রচয়িতা আপশোস করে বলছেন:

না হইলে কর্ম শেষ, কত আসিব কত যাইব।
সং সেজে সংসারের মাঝে কত হাসিব কত কাঁদিব।
ভূষণ বলে কবে আসিব এ জ্বালা কবে নাশিব।
মহাযোগে কবে বসিব, দেখব হরির পদ রাজে।

আসা যাওয়ার পথ-কষ্ট আর সইতে পারি না প্রভু। আমার মোহ দূর কর, আমাকে বুঝতে দাও আমার সত্যিকারের পরিচয়, নিষ্কৃতি দাও সং সেজে বেড়াবার হাত থেকে। তুলে নাও তোমার রাজীব পদে।

মুহূর্তের জন্য আসে গাঁয়ের মানুষের বিস্মৃতি, ভুলে যায় আপন কাজ। মনে জেগে ওঠে সংসারের অসারতা, সং সেজে বেড়াবার দুঃখজনক অনুভূতি। মর্মে বেজে ওঠে বাঁশীর ডাক—ওরে আয়, ফিরে আয় ঘরের ছেলে ঘরে। মানুষ বুঝে উঠতে চায় নিজের স্বরূপটাকে। কিন্তু মানুষের মন তো পানাপুকুর। পানা সরিয়ে দাও আবার যেখানকার যে সে এসে উপস্থিত হবে।

বেন্দু গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইদের বাড়ি।

বাড়ির দাওয়ায় বসে বাড়ির কর্তা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। একটু উদ্বিগ্ন মন। হাতের হুঁকো হাতে রয়েছে টানতেও ভুলে গেছেন। বাউলের সুর এল কানে—গানের কথাগুলিও। একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। ভাবলেন এ রঙ্গমঞ্চের খেলা আর কতদিন খেলাবে হরি! এবার শ্রীপাদপদ্মে স্থান দাও।

বাড়ির ভেতর থেকে খবর এল একটি ছেলে হয়েছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। স্ত্রীর আসন্ন প্রসবের চিন্তাজনিত মনের যে উদ্বিগ্নতা তা গেল দূর হয়ে। ভুলে গেলেন কিছুক্ষণ আগের দার্শনিকতা। প্রাণভরে টানছেন হুঁকো। উৎসাহের প্রাবল্যে খেয়াল নেই যে, কল্কের আগুন অনেকক্ষণ হল নিবে গেছে। এমনই হয়। পূর্ণতার মধ্যে ভগবানের স্থান কোথায়? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ছেলে এটি।

দিন যায়, শিশু হয়ে ওঠে বালক। নামকরণ করা হল সীতানাথ। সীতানাথ ক্রমে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্গী-সাথীর

বালাই নেই। কারো সঙ্গে মিশতেই চায়না। একা ঘরে বসে থাকতেই ভালবাসে। কি যে ওর মনের ভাব কেউ যদি বোঝে! বড় ভ্রাতৃবধূরা ওকে নিয়ে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন। কিন্তু তার মৌন গাম্ভীর্যের কাছে সমস্ত বিফল হয়ে যায়।

সে যুগের কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে। বিবাহের বাজারে তার কত দাম। কিন্তু ধনুর্ভাঙা পণ, সীতানাথ কিছুতেই বিয়ে করবেন না। পিতামাতার কত সাধাসাধি, বড় ভাইদের কত পীড়াপীড়ি, ভ্রাতৃবধূদের কত অনুরোধ। কোন কিছুই তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারল না।

সন্ন্যাসী নয় গৃহী। অথচ বিবাহের প্রতি এই বীতরাগ। সকলের কাছে অদ্ভুত লাগে!

এমনি করে চলে দিন—মাস গড়িয়ে বছর।

যুবক সীতানাথ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায়। চলে যাওয়া বছরগুলির সঙ্গে এসেছে সংসারে কত পরিবর্তন। মা গিয়েছেন আগে, পরে গেছেন পিতা, সংসারের মায়া ত্যাগ করে জীবন-নদীর ওপারে। দাদারাও হয়েছেন বৃদ্ধ। বৌয়েরা—পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনী পরিবেষ্টিত সংসারের মায়াপাশে বদ্ধ। নিত্য নূতনের আবির্ভাব, পুরাতনের মেয়াদ এসেছে ফুরিয়ে—এসেছে পরপারের ডাক।

খায়-দায় বসে দিন গোনে। হাই ওঠার সঙ্গে তুড়ি দিতে দিতে বলে—হরি হে পার কর। কিন্তু এ পৃথিবীর মেয়াদ কার যে কত দিনের তা কি কেউ জানে?

কেউ জানে না। তাই বৃদ্ধ দাদারা অবাক হয়ে চেয়ে দেখলেন —সে পিছে এসে আগে গেল। দুস্তর ভব-সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে তাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সীতানাথ। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে

পৃথিবীর শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেড়ু গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র।

মৃত্যুর পরে মানুষ যায় কোথায়? এ একটা সমস্যা! মানব মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা। কঠোপনিষদের প্রথমে তাই এই প্রশ্ন—

"যেয়ম্ প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তি চৈকে

কেউ বলেন, মরে গেলেও তার অস্তিত্ব থাকে; কেউ বলেন থাকে না। এর কোনটি সত্য? বিভিন্ন দর্শন বা বিভিন্ন ধর্মে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে। অনেকে আবার এই প্রশ্নকে নানা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে বাতিল করে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু যতদিন মৃত্যু বলে জগতে কিছু থাকবে, পরিদৃশ্যমান জগতের সব কিছু প্রিয় জিনিসের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিরহের সম্ভাবনা ততদিন এই প্রশ্নকে মনের মধ্যে জাগরূক করে রাখবেই!

যুক্তির বেড়াজাল দিয়ে মনকে মানুষ যতই চোখ ঠেরে রাখতে চাক না কেন, অবচেতন মনের অন্তরতম প্রদেশ থেকে যখন এই প্রশ্ন জেগে উঠবে, তখন তাকে ঠেকাবে কি দিয়ে? এই দেহ যা কতকগুলি ভৌতিক অনুর সমষ্টি মাত্র, এর মধ্যে কি কিছু সত্য নেই?

মানব জীবনের ইতিহাসে এই তত্ত্ব নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। অতি প্রাচীনকালেই মানব মনে এই তত্ত্বের অস্ফুট আলোক দেখা দিয়েছে। তখন থেকে মানুষ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের জ্ঞান লাভ করেছে। সূক্ষ্ম দেহ এই দেহেরই অনুরূপ। স্থূল দেহ ধ্বংস হয়ে যায়। সূক্ষ্মদেহ ধ্বংস হয় না। পরলোকে কর্মোপযোগী স্থান প্রাপ্ত হয়। আবার প্রয়োজনানুসারে নেমে আসে ধরার বুকে যতদিন না ছিন্ন হয়ে যায় আসা-যাওয়ার টানাপোড়েন। সীতা-

নাথের সূক্ষ্ম দেহ ভৌতিক দেহের সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করে চলে ঊর্ধ্বে নতুন জগতে।

বস্তু-জগতে তার দেহের যে আকৃতি ছিল, এই পরলোকেও তার ঠিক সেরূপ দেহই। সেই রকম অনুভূতি, চলৎ-শক্তি। তবে জড় দেহের বন্ধন মুক্ত হওয়ায় অনুভূতি অনেক ব্যাপক, গতি অনেক ক্ষিপ্র। মৃত্যুজনিত পরিবর্তনে কিছুই হারায় নি।

এখানে বৃদ্ধ কেউ নেই, সকলেরই চিরযৌবন। এখানে বয়স বছরের হিসেব দিয়ে গণনা করা হয় না। জড়জগতে সময় বলতে যা বোঝায় এখানে তা নেই। মাস, বছর দিয়ে বয়স গণনা অবান্তর। পার্থিব সময়ের আপেক্ষিকতার অভিজ্ঞতা হয় ঘুমন্ত অবস্থায়। ঘুমের অবস্থায় স্বপ্নে মানুষ যে সমস্ত কাজ কর্ম করে, জাগ্রত অবস্থায় তা করতে হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। অথচ স্বপ্নে তা নিমেষে সম্পন্ন হয়।

এই জগৎ স্বপ্ন বা কল্পনার বস্তু নয়। জড় জগতের অনুরূপ এ যেন আর একটি জগৎ। পৃথিবীর ন্যায় সব কিছু বস্তুরই অস্তিত্ব আছে সূক্ষ্মাকারে। সেই ফুলের গন্ধ, ফলের স্বাদ, পাখির কলতান, প্রকৃতির সৌন্দর্য সবই এক, শুধু প্রকারভেদ।

সীতানাথ তার এই নতুন পরিবেশে মুগ্ধ ও বিস্মিত। কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না। অবস্থাটাকে সম্যক উপলব্ধি করে নেবার জন্য চেষ্টা সে করছে। কিন্তু পারছে না। সে অনুভব করছে আর একটা আকর্ষণ। কে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কানের কাছে বলছে : এখনও শেষ হয়নি, কর্মের বহু জটিল গ্রন্থি খুলতে হবে তোমাকে। ফিরে যেতে হবে। কর্ম করেই কর্ম বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে হবে। তবেই হবে আসা-যাওয়ার সমাপ্তি। উপায় নেই, অবলম্বনও নেই কিছু আঁকড়ে ধরে থাকার। মোহমুগ্ধের মত পুনরায় নেমে এল।

তারপর? তারপর নতুন কলেবর নিয়ে সীতানাথ নেমে এল ধরার বুকে—ভবের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন লোকনাথের ভূমিকায়।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ লোকনাথ গুরু ভগবানকে নিবেদন করলেন সমস্ত স্বল্প অনুভূত কাহিনী। গুরুও বিস্মিত হলেন কম নয়। কিন্তু জ্ঞানের পূজারী তিনি—তিনি চাইলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করে নিতে চাইলেন সমস্ত ঘটনা। তাই শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে লোকনাথের বর্ণনা মত 'বেড়ু' গ্রামে উপস্থিত হলেন এবং সে সময়ের লোকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় সীতানাথের তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন। সে বংশের কেউ কেউ এখনও সে গাঁয়ে বসবাস করছেন। আনন্দে ভরে উঠল ভগবানের হৃদয়। শিষ্য জাতিস্মরতা লাভ করেছেন।

নদী পার হয়ে মাঠ। মাঠের ভিতর দিয়ে চলেছে পায়ে চলা পথ। পথের দু'পাশে ধানের ক্ষেত, ফলের বাগান, পুকুর, গ্রাম। গ্রামবাসীরা কৌতূহলী হয়ে চেয়ে দেখে। কেউ কেউ তাঁদের গন্তব্য স্থান জানার আগ্রহে প্রশ্ন করে। কেউ বা আতিথ্য গ্রহণের জন্য জানায় অভ্যর্থনা।

এমনি করে মাঠ, জনপদ পার হয়ে কালনার রাস্তা ধরে চললেন গুরুশিষ্য। রাস্তার দু'পাশে জঙ্গল, লোকবসতি বিরল। দু'এক খানা গরুর গাড়ির সঙ্গে পথে দেখা হয়। দূর-প্রসারী আওয়াজ তুলে গরুর গাড়ি চলে মাটির রাস্তার উপর দাগ কেটে।

গাড়ির ভিতর মাল বোঝাই। মাটির তৈরি তৈজসপত্র। মালের মালিক চলছে হেঁটে। গাড়ি যাবে নিকটেই কোন হাটে। মহাজন শুধোয়, বাবারা কোথা যাবেন গো?

—চব্বিশ পরগণা।

—অনেক দূরের পথ, লয়? গাড়োয়ান প্রশ্ন করে।

যাত্রীদের কাছ থেকে কোন উত্তর আসে না। গাড়ির সীমানা ছেড়ে তাঁরা যান এগিয়ে। দূরে ভেসে আসে গাড়ির চাকার আওয়াজের সঙ্গে গাড়োয়ানের গানের একটি কলি।

গুরু তোমার চরণ পাব বলেরে
বড় আশা ছিল।
আশা-নদীর কুলে বইসে
আমার আশায় জনম গেল।

মানুষের মনে কত আশা! সকল আশাই কি মেটে? মেটে না। তবু মানুষ আশা নিয়েই বেঁচে থাকে। আশার পেছনে ছুটে চলে। আশা কুহকিনী।

যাত্রীরা এগিয়ে চলে, পিছনকে দূরে সরিয়ে সামনের যা কিছু পিছনে ফেলে গৃহে পৌঁছাবার আশা নিয়ে।

রাতের অন্ধকারে তাঁরা এসে গ্রামের সীমানায় পা দিলেন; কিন্তু গ্রামে প্রবেশ করলেন না। গ্রামে ঢোকবার মুখে পত্রবহুল এক অশ্বত্থ বৃক্ষ যে পথিককে আশ্রয় দেবার জন্য সস্নেহ আহ্বান জানাচ্ছে! গ্রাম-প্রহরীর মত প্রাচীন এই বৃক্ষের আহ্বানকে কি অবহেলা করা যায়! তাই তাঁরা ঠাঁই নিলেন পিতামহতুল্য সুপ্রাচীন এই অশ্বত্থ বৃক্ষের স্নেহসম্পুটে। বিরাট অশ্বত্থের পাদপীঠে গড়ে উঠল তাঁদের আস্তানা!

পরদিন সকাল বেলা। রাখালেরা গ্রামের গরু-বাছুর নিয়ে এসেছে চড়াবার জন্য। তারা দেখে তাদের চিরপরিচিত অবসর যাপনের স্থানটির কিয়দংশ দখল করে বসে আছে তিনটি অপরিচিত লোক। অদ্ভুত তাদের চেহারা। মাথায় জটা, পরনে লেংটি। হাতে প্রকাণ্ড দণ্ড।

রাখালেরা পরম সমীহ করে দূরে দাঁড়িয়ে দেখে। অন্তরে তাদের

রাজ্যের কৌতূহল। কোন্ অজানা দেশের লোক এঁরা? কোথা থেকে এসেছে, কোথা যাবে কে জানে? এঁরা কি খায়, কি করে, দেখার জন্য, জানার জন্য ঔৎসুক্যের সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু সাহস নেই যে এগিয়ে গিয়ে দুটো প্রশ্ন করে। তাই দূরে দাঁড়িয়ে করে জটলা। নিজেদের ভেতর হয় জল্পনা-কল্পনা।

পৃথিবীতে নবাগত এরা। সংসারে কতটুকুই বা দেখেছে, জেনেছেই বা কতটুকু? তবু তাদের সাধ্যানুসারে তারা করে কল্পনা—মুখে মুখে রচনা করে নানা সম্ভব-অসম্ভব গল্প।

গল্প ছড়িয়ে পরে গ্রামে। এ-কান সে-কান করে বড়দের কানে গিয়ে খবরটা পৌছয়।

সাধু-সন্ন্যাসীদের উপর মেয়েদের দাবী সর্বাগ্রে। দেখতে দেখতে মেয়ে মহলে সাড়া পড়ে গেল। কারোর স্বামীর অসুখ, ছেলের পিলে, মেয়ের বিয়ে নিয়ে সমস্যা। গাছের শিকর, ধুনীর ছাই, যা হোক একটা কিছু তাদের চাই। এই যদি দিতে না পারল তা হলে কিসের সাধু! ঘরের বউ, গাঁয়ের মেয়ে এরাই দর্শকের দলে ভিড় বাড়িয়েছে। এরা সকলেই নবাগত। কেউ এসেছে ভিন গাঁ থেকে গাঁয়ের বধূ হয়ে, মেয়েরা গাঁয়ের মাটিতে পা দিয়েছেন এই সেদিন। দিন তারিখ সবার মুখে মুখে। কি জানে তারা তিরিশ বছর আগেকার দেশের ইতিহাস?

ভিড় ক্রমেই বাড়তে থাকে।

এবারে আসেন প্রৌঢ়া - সধবা বিধবা দু'দলই। গাঁয়ের ঠাকুমা, জেঠমা, পিসিমার দল। ব্রহ্মচারীদের অভিনব বেশ সত্ত্বেও একজনের দৃষ্টি কিন্তু চিনে ফেলল পরিচিতজনকে। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলে—লোকনাথদা।

সকলের চোখের সামনের যবনিকা খুলে গেল। দৃষ্টি হয়ে উঠল স্বচ্ছ।

এ যে বেণীমাধব গাঙুলী মশাই !

বিস্ময়ের আনন্দের ছোঁয়া লাগল সবার দৃষ্টিতে, ঔৎসুক্যের প্রাবল্যে জনতা হয়ে উঠল প্রশ্ন-চঞ্চল। বিদ্যুতের মত খবর ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। গাঁয়ের ছেলে ফিরে এসেছে গাঁয়ে সুদীর্ঘ বছর পর। দেবলোকের সুষমা অলৌকিক তপোবন কল্পলোকের ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে। ত্রিশ বছর আগে যারা ছিল যুবক তারা আজ হয়েছে প্রৌঢ়, প্রৌঢ়রা হয়েছেন প্রাচীন। অনেকে চলে গেছেন, অনেকে পা দিয়ে আছেন অন্তিম-যাত্রার পথে। প্রাচীনদের মধ্যে তখনও জীবিত ছিলেন যাঁরা, তাঁরাও এসে প্রথমত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। ভাবেন, সত্যি কি এই লোকনাথ, এই আমাদের বেণীমাধব। কি দেহের প্রভা—কি চোখের দৃষ্টি ! কোন্ দেবলোক থেকে এরা নেমে এল পুতি-গন্ধময় মর্ত্যের এই কোলাহলে। কোন্ দেবতার হাতের তৈরি এই দুটি দেব-শিশু ?

ভগবান গাঙুলী ? সকলের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল। বেঁচে আছেন সে বৃদ্ধ এখনও ! ঐ যে গাঙুলী মশাই। মেয়েদের ভিড় সরিয়ে প্রাচীনেরা এগিয়ে এলেন। জানালেন তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা।

সু-স্বাগতম ! হে গ্রামের অতি বৃদ্ধ মহাপুরুষ, আপনার শুভ পাদস্পর্শে গ্রাম আজ ধন্য হোক, দূরে যাক গ্রামবাসীদের সমস্ত অমঙ্গল, পূত-পবিত্র হয়ে উঠুক আমাদের জীবন।

অভ্যর্থনার মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠল চারদিকে।

ত্রিশ বছর আগের একটা ছবি। সেদিন সুমিত্রার চোখে পৃথিবী দেখা দিয়েছিল নূতন এক রূপ নিয়ে। এখানকার সব কিছুর উপর ছিল তার দারুণ কৌতূহল।

তাই ত সবার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও তিরিশ বছর

পরে এত পরিবর্তন সত্ত্বেও সুমিত্রার চোখকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নি।

সাধু বেশের আবরণে ঢাকা লোকনাথ তার প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছিল। বহুদিনের বদ্ধ মণি-কোঠার দরজা কোন অদৃশ্য হাতের স্পর্শে খুলে গেল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল লোকনাথের সেই ছবি। পরনে লাল চেলি, কপালে রক্তচন্দনের লেখা, ভাব-লেশহীন চোখের সেই দৃষ্টি! গমনের দৃপ্তভঙ্গী। সব কিছু মিলিয়ে তার মনের ভিতর কী অপরূপ হয়েই না দেখা দিয়েছিল ?

ন'বছর বয়সে তার বাপ, মা মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে গৌরীদানের পুণ্য অর্জন করেছিলেন। আজ তাঁরা কেউ বেঁচে নেই। গৌরীদানের ফলে তাঁদের হয়ত অক্ষয় স্বর্গবাস হয়েছে, কিন্তু গৌরীর নিজের ভাগ্যে যেটা এসেছিল সেটা বছরের মধ্যে ঘুরে আসা বৈধব্য দশা। বাঙালীর ঘরের বিধবার অভিশাপ নিয়ে সে ফিরে এসেছে পুনরায় পিত্রালয়ে! কিন্তু জীবনের এই পরিবর্তনে কি সে পেয়েছে এবং কি তার গিয়েছে, এই নিয়ে চুলচেরা হিসাব-নিকাশ করার না ছিল তার বয়েস, না ছিল কোন অভিজ্ঞতা। তা সে করেও নি। তার বাল্যসুহৃদ, তার আদর্শ গুরু লোকনাথ। তাঁরই আদর্শের জের এখনো চলছে। পূজারিণী সে, ব্রহ্মচর্য তার ব্রত। মনে প্রাণে সে নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণী। সংসারে তার কোন আকর্ষণ নেই।

ভাই-এর সংসার। ভ্রাতৃবধূরা গৃহকর্ত্রী। না আছে তার কোন প্রতিষ্ঠা, না আছে কোন প্রয়োজন। তাদের সংসারে সুমিত্রা বাহুল্য মাত্র। অবশ্য তার জন্য সুমিত্রার কোন দুঃখ নেই। তার নির্ধারিত কর্তব্যটুকু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারলেই সে সুখী।

আজ সুমিত্রার আনন্দের সীমা নেই। যা আশাতীত, কল্প-নাতীত তাই আজ ঘটেছে। তার দেবতা, তার গুরু, তার প্রিয়তম

আজ উপস্থিত। এ জীবনে যে আর লোকনাথের সাথে দেখা হবে এ আশা সুমিত্রা কোনদিন করেনি। তাই পুনর্মিলনের এই আনন্দে তার হৃদয় উদ্বেলিত। তার সেবা-কাতর মন তখুনি তার সমস্ত সত্ত্বা বিলিয়ে দিয়ে লোকনাথের সেবার জন্য উন্মুখ।

লোকনাথের মা বেঁচে নেই, পিতা বৃদ্ধ।

লোকনাথের সেবার ভার সুমিত্রার উপর দিতে পেরে ভ্রাতৃবধূরাও সুখী। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর, আচারনিষ্ঠার ত্রুটিতে কোন্ অমঙ্গল হয় কে জানে? তার চেয়ে সুমিত্রার উপর সমস্ত ভার ফেলে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত।

হলও তাই, সুমিত্রার আন্তরিক সেবায় সকলেই মুগ্ধ। লোকনাথেরও কোন অভিযোগ নেই। দেবতা সুখী। তাই সাহস পেয়ে ভক্ত পূজারিণী জানাল তার অভিলাষ। তার এই সেবা নিষ্কাম নয়। সে বরপ্রার্থিণী। লোকনাথের সহগামিনী হয়ে সে-ও সংসার ত্যাগ করতে ইচ্ছুক।

কিন্তু দেবতা পাষাণ। বহু কাতর আবেদনেও সে পাষাণে একটু দাগ কাটতে পারল না। প্রার্থিত বর তার মিলল না।

দেবতা চলে গেলেন চিরতরে।

মিছে তার ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, মিছে তার মঙ্গলঘট দেওয়া। অনাঘ্রাতা একটি কুসুম, অনাদরে পড়ে রইল পুষ্পপাত্রের একধারে, আশা নিয়ে জন্মান্তরের পথ চেয়ে।

জ্ঞানের পূজারী ভগবান, কোন কিছু নির্বিচারে মেনে নেওয়া তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বুদ্ধি দিয়ে, বিচার করে পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করে না নেওয়া পর্যন্ত তাঁর সান্ত্বনা কোথায়!

পথের সন্ধানে আচার্য ভগবান। সাধনার চৌরাস্তায় এসে

তিনি উপস্থিত। কোন্ পথে তিনি শিষ্যদের চালাবেন ? নানা মত নানা পথের কোনটি সহজ, কোনটি সরল ?

প্রাথমিক প্রস্তুতি শিষ্যদের তিনি করিয়েছেন দীর্ঘ ত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য সাধন করিয়ে। পথের দুর্গমতা আর হবেনা তাদের পথ চলার বাধা, ক্ষুৎপিপাসায় আসবে না কাতরতা। তথাপি প্রিয় সন্তানের জন্য গন্তব্যস্থানে পৌঁছাবার সহজ পথটি কোন্ পিতা না খোঁজেন ? তাই শুরু হল পথের অনুসন্ধান।

ভারতে তখনো মুসলমানদের প্রাধান্য। পাশাপাশি বাস করছে হিন্দু মুসলমান। প্রতিবেশী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। মুসলমানের ধর্ম আচরণের সঙ্গে হিন্দুর ধর্মাচরণের আপাতদৃষ্টিতে কোন মিল নেই। তাই উভয় জাতির মধ্যে ধর্ম নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু একই দেশে, পরস্পর পাশাপাশি বাস করে এই মনোভাব থাকা ত সমীচীন নয়। সুতরাং তাকে দেখতে হবে, জানতে হবে মূল তত্ত্বে কোন প্রভেদ আছে কিনা। খুঁজে বের করতে হবে সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য তাদের পথটাই বা কি ?

যাত্রা হল শুরু। জ্ঞানপিপাসী আচার্য ভগবান সশিষ্য রওনা হলেন কাবুলের পথে মুসলমান ধর্মের মূল তত্ত্ব অনুসন্ধানে।

দুর্গম গিরি-কান্তার অতিক্রম করে তাঁরা এলেন কাবুল। কাবুলের বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ মোল্লা সাদী। গুরু ভগবান সশিষ্য গ্রহণ করলেন মোল্লাসাদীর শিষ্যত্ব। আরম্ভ হল তাঁদের পঠন-পাঠন। শিষ্যসহ ভগবান কোরাণের পাঠ নিলেন।

যথাসময়ে গুরুগৃহের পাঠ সমাপন হল। এবার প্রত্যাবর্তনের পালা। গুরুর আশীর্বাদ গ্রহণান্তে রওনা হলেন ভারতের পথে।

ভগবানের নব জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা মিটেছে। খুঁজে

পেয়েছেন তিনি পথের সন্ধান। পরশ পাথরের ঝোলা কাঁধে বহন করে বৃথাই তা খুঁজে বেরিয়েছেন পথে পথে।

ব্রহ্মচর্য তপস্যার মূল। এটা তিনি পূর্বেই বুঝেছিলেন, তাই লোকনাথকে পাতঞ্জল ও গীতা আচরিত ব্রহ্মচর্য ব্রত উদযাপন করিয়েছিলেন। এবার ক্ষেত্র প্রস্তুত। এখন বীজবপনের সময় উপস্থিত। আর তো বিলম্ব করা চলে না। তিনি বুঝেছেন বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্মজ্ঞান, পাতঞ্জলের কর্ম ও ধ্যানযোগ, গীতার ভক্তি ও ভগবৎ-সাযুজ্যের সমন্বয়ে হবে লোকনাথের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিপূর্ণতা। কর্ম-মার্গের এই চরম ফল লাভ করার জন্য লোকনাথকে হতে হবে যোগী।

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী-জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন॥"

তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ ; অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।

লোকনাথকে যোগী হতে হবে. সাধন করতে হবে অষ্টাঙ্গ যোগ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। অর্জন করতে হবে অষ্টৈশ্বর্য—অণিমা, লঘিমা, প্রভৃতি। এ সাধনার জন্য প্রয়োজন জনহীন প্রদেশ। সঙ্গশূন্য, সংযতচিত্ত. সংযতদেহ, আকাঙ্ক্ষারহিত ও পরিগ্রহশূন্য হয়ে মনকে ভগবদ্ ধ্যানে সমাহিত করতে হবে। সেই অনুকূল পরিবেশ নির্ধারিত হল হিমালয়ের মধ্যদেশে অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগুহায়।

বহির্জগতের সঙ্গে ছিন্ন হল সমস্ত সম্পর্ক। ইতিহাস থেকে মুছে গেল সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্"– কবির এই উক্তি সার্থক হয়ে দেখা দিল। অবিভক্ত গুরুভক্তি ও একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য দ্বারা লোকনাথ শুধু গুরুর পঠিত বিদ্যাই অর্জন করেন নি,

যোগ সাধনার দ্বারা তাঁর সিদ্ধিলাভও হয়েছে। ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ গুরুভক্তির অবিসম্বাদী ফল। চল্লিশ বছর পর যবনিকার অন্তরালে দেখা গেল যোগরত লোকনাথকে। সর্বাঙ্গে তুষারের শুভ্রতা, মস্তকের কেশ জটা হয়ে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, ধ্যানস্তিমিত নেত্র, শুভ্র শ্মশ্রু, অপূর্ব দেহজ্যোতি। যেন জীবন্ত শিব।

মুখের উপর লেখা আছে স্নিগ্ধ হাসি—উদয়াচলের প্রথম রাগ-রশ্মি। দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু থেকে স্বেদবিন্দু শত মৃগনাভির সুবাস নিয়ে নির্গত হচ্ছে। তাঁর প্রভায় অন্ধকার গুহা হয়ে উঠেছে স্নিগ্ধকিরণোজ্জ্বল। অপূর্ব পরিবেশ, অভূতপূর্ব অনুভূতি—স্বর্গীয় এক সুষমায় আচ্ছাদিত সমস্ত বনপ্রদেশ, সমস্ত পাহাড়।

গুরু ভগবান নির্নিমেষ নয়নে অবলোকন করছেন পুত্রাধিক স্নেহাস্পদ শিষ্য লোকনাথকে। সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রতিটি চিহ্ন তাঁর দেব-দেহে প্রকাশিত। সাফল্যের আনন্দে, উৎসাহে ভরে উঠেছে বুক। ওই যোগবিভূতি সম্পন্ন সুকুমার তনুকে অশান্ত বুকের উপর চেপে ধরবার আকাঙ্ক্ষায় প্রতিক্ষণে উদ্বেল হয়ে উঠছে হৃদয়। কিন্তু একি! শরতের নীলাকাশে বিদ্যুতের চমক! আষাঢ়ের মেঘে ঢাকা পূর্ণিমার চাঁদ। ধরার বুকে নেমে এসেছে শ্রাবণের ধারা।

লোকনাথের চোখে জল। বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভগবান।

সহসা আর্তস্বরে কেঁদে উঠলেন লোকনাথ। ধ্যানভগ্ন যোগী নেমে এসেছেন ধরার ধূলিতে। যাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে লোকনাথ আজ সংসার সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ, সেই গুরু রইলেন পারের আশায় বসে।

গুরুদেব তোমার অপার করুণা বলে আমি পার হয়ে এলাম। কিন্তু তুমি রয়ে গেলে অপর পারে। এ দৃশ্য কিছুতে সহ্য করতে পারছি না, প্রভু।

শিষ্যের কৃতকার্যতাই গুরুর পুরস্কার। তথাপি তিনি বুঝলেন, জীবনব্যাপী তাঁর ভুল। কর্মদ্বারা সিদ্ধিলাভের বিশ্বাস তাঁর ছিল না, কিন্তু শিষ্যের মাধ্যমে পরীক্ষিত সে সত্য আজ উপলব্ধি হল। তাই তিনি লোকনাথের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। বললেন, জ্ঞানের পূজারী আমি, কর্মমার্গে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনায় ছিল সন্দেহ। সে সন্দেহ আজ আর আমার নেই। কিন্তু সময়ও নেই নূতন করে ব্রত উদযাপন করার। তাই স্থির করেছি শীঘ্রই দেহত্যাগ করব। ভবিষ্যৎ জন্মে তুমি হবে আমার পথ প্রদর্শক, আমার গুরু, আমার কর্মমার্গের পরিচালক।

ভবিষ্যৎ বাসনা। পিতা জায়তে পুত্র। এই আশা নিয়েই চলে সংসারের টানাপোড়েন। আসা-যাওয়ার পুনরাবৃত্তি।

গুরু ভগবান উন্মনা। কি যে ভাবেন নিজেও জানেন না। দেহে এসেছে বয়সোচিত শৈথিল্য, সর্বকাজে অনিচ্ছা। একটা অবসাদ দেহমনে। ত্রুটিহীন দৈনন্দিন কাজে পড়ছে ছেদ। মাঝে মাঝে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। তখনই মনকে নাড়াচাড়া দিয়ে কোন মতে সাময়িক সক্রিয়তা ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু তার স্থায়িত্ব কতটুকু! যে প্রেরণা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত তার উৎস যেন আজ রুদ্ধ। জীবন-নদীতে এসেছে ভাঁটা। কোন কাজে আগের মত আর উৎসাহ উদ্দীপনা নেই। শিষ্যদের দৃষ্টিতেও গুরুর এই ভাবান্তর ধরা পড়েছে। কিন্তু কারণ কিছু খুঁজে বার করতে পারেনি তাঁরা। বার্ধক্যের অজুহাত শিষ্যদের কাছে অচল। কেননা বয়স তার যথেষ্ট হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দৈহিক অসামর্থ্যের কোন প্রকাশ আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। অবশ্য আগে হয়নি বলে যে এখন হবে না এ-নিশ্চয়তা এ বয়সে দেওয়া চলে না। লোকনাথ চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

—চল না বাবা আমরা অন্য কোথাও যাই।

বিস্মিত ভগবান লোকনাথের মুখের প্রতি দৃষ্টি তুলে বললেন :

—হঠাৎ স্থানত্যাগের ইচ্ছা কেন, লোকনাথ ?

—অনেক বছর এক জায়গায় কাটিয়ে দিলুম। তা ছাড়া, তোমার শরীর এখানে ভাল যাচ্ছে না।

—শরীর ? এ ত অনিত্য লোকনাথ। চিরকাল ভাল থাকার ত কথা নয়। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন : বেশ, তাই হোক। চল এবার কাশীর পথে যাওয়া যাক।

—তাই চল বাবা।

হিমালয় থেকে কাশীর পথে রওনা হলেন তিনজন। পথের মাঝে দেখা হল আর এক মহাপুরুষের সঙ্গে। হিতলাল মিশ্র। এক সময়ে ইনি কাশীতে ত্রৈলিঙ্গস্বামী নামে খ্যাত ছিলেন। বহুদিনের মানুষ। জাতিস্মর। তিন জন্মের কথা জানতেন।

চারজন মিলে চলে এলেন কাশীতে। ঠিক হল কিছুদিন কাশীতে থাকবেন।

পুরনো লোক হিতলাল। বয়োবৃদ্ধ, সিদ্ধ মহাপুরুষ। একদিন ভগবান তাঁর হাত দুটি ধরে অনুনয় করে বললেন :

—মহারাজ, অনিত্য সংসারে অনিত্য এই দেহ। কখন থাকে কখন যায় কে জানে ? তাই সময় থাকতে একটি প্রার্থনা জানিয়ে রাখতে চাই। আমার এই দুই নাবালক শিশু, আমার অবর্তমানে এদের সমস্ত ভার তোমার। তুমি এদের দেখ।

হিতলাল ভগবানের মুখের দিকে চেয়ে কি বুঝলেন কে জানে! তবে তিনি ভগবানের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। সম্মত হলেন নাবালকদের ভার গ্রহণ করতে। লোকনাথ বেণীমাধবের তখন বয়স নব্বই এর বেশি। ভগবানের বয়স একশ ষাট। গুরুর কাছে শিষ্য আর পিতার কাছে পুত্র চিরকালই নাবালক। তারপর একদিন প্রভাতে গুরু ভগবান গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে আর ফিরে এলেন না।

নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হবার পর গুরুকে ফিরতে না দেখে লোকনাথ চিন্তিত হলেন। সহচর বেণীমাধব ও গুরুতুল্য আচার্য হিতলাল মিশ্রকে নিয়ে তিনি গঙ্গার ঘাটে এলেন। দেখেন, গুরু ভগবান যোগাসনে উপবিষ্ট। মনে হল বসে জপ করছেন। কিছুক্ষণ সকলে দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন কিন্তু লোকনাথের মনে দেখা দিল সংশয়। হঠাৎ গুরুর দেহস্পর্শ করে ধাক্কা দিয়ে বলে উঠলেন, ওঠ, তোমার আবার জপ!

কিন্তু কথা শেষ হল না, লোকনাথের হস্তস্পর্শে ভগবানের প্রাণহীন দেহ আসন থেকে মাটিতে পড়ে গেল। গুরু ভগবান দেহত্যাগ করেছেন।

একাধারে গুরু, পিতা, মাতা, বন্ধু। এগার বছর বয়স থেকে আজ নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত যাঁর স্নেহচ্ছায়ায় থেকে পরম নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিয়েছে শিষ্যরা! সেই ছায়া গেল সরে, মাথার উপর নেমে এল মধ্যাহ্নের সূর্যতাপ। লোকনাথের চোখে এল জল। শাস্ত্রীয় অনুশাসন, কোন বিধিনিষেধ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না স্বতোৎসারিত এই অশ্রুকে। হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি সমস্ত কৃতজ্ঞতা চোখের জল হয়ে নেমে এল। কিন্তু কর্তব্যের কোনো এটি হল না। শ্রদ্ধেয় হিতলাল মিশ্রের ব্যবস্থাপনায় ভগবানের অন্তিম শয্যা প্রস্তুত হল মনিকর্ণিকার ঘাটে। অগ্নি স্পর্শ করল আচার্যের পূত-দেহ। সজল কণ্ঠে দুই বন্ধু গাইলেন গুরু বন্দনা।

গুরোর্ব্রহ্মা, গুরোর্বিষ্ণুঃ, গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

লোকনাথের জীবনে দেখা দিল নূতন অধ্যায়। এতদিন সর্ব কাজে ছিলেন গুরুদেব। তাঁর নির্দেশমত চলত সকল কাজ। জীবনতরণীর কাণ্ডারী ছিলেন তিনি। কিন্তু আজ কাণ্ডারীহীন

এ তরণী বেয়ে যেতে হবে। এমনিই হয়। দু'চারদিন অসুবিধা, তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। কারো অভাবে সংসারে কিছুই ঠেকে থাকে না। বিচিত্র এই পৃথিবী। গুরুর দেহত্যাগের পর লোকনাথ বের হলেন পৃথিবী পর্যটনে। সঙ্গে বেণীমাধব ও হিতলাল মিশ্র।

জীবকোটি, ঈশ্বরকোটি। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে নিজের পারলৌকিক উন্নতি করা লোকনাথের উদ্দেশ্য নয়। তাকে জগৎশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তাকে দেখতে হবে, শিখতে হবে অনেক কিছু। বড়লোকের বাড়িতে এসে কর্তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে মাত্র, এবার চারদিক ঘুরে ফিরে তাঁর ঐশ্বর্য দেখতে হবে না? তাঁর স্বহস্ত রচিত নন্দন-কানন—কোন ধারে ফুল গাছ, কোন ধারে বা ফল! লতা পাতা বসাবার গুণে পরম শোভাময় হয়েছে এই কানন—সৃষ্টি কর্তার শিল্পী মনের পরিচয়। এই পরিচয় না পেলে দেখা বা জানায় থেকে যাবে অপূর্ণতা। নিজের মুক্তি নিয়ে সন্তুষ্ট, এমন জীবকোটি সে নয়। ঈশ্বরকোটি লোকনাথ। অধীত বিদ্যার সনদ তাকে নিতে হবে। শুধু থিওরিতে হবে কেন, প্র্যাকটিক্যাল হওয়া চাই। ঈশ্বরের চাপরাশ হাতে নিয়ে তাকে বসতে হবে লোকশিক্ষার জন্য।

তাই তাঁরা চললেন দেশভ্রমণে!

প্রথমে আরব দেশ। মক্কা, মদিনা, মক্কেশ্বর—মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান তীর্থস্থান। প্যালেস্টাইন—খ্রীস্টানদের ধর্মভূমি।

পৃথিবীতে কত ধর্ম, কত রকমের জাত, কত রকমের ভাষা। আচার ব্যবহার সামাজিক রীতিনীতি কত বিভিন্ন। এত বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার মধ্যে কোথায়ও ঐক্যের চাবিকাঠি লুকানো আছে। এ বিষয়ে লোকনাথ নিঃসন্দেহ। সেই চাবিকাঠির সন্ধান জানতে

হবে, খুঁজে বের করতে হবে। লোককে জানাতে হবে সেই মূল ঐক্য সূত্রটি। পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে, চড়াই উৎরাই পার হয়ে তাই আজ উপস্থিত হলেন বিশাল সমুদ্রের কিনারে।

জল নয়, শুধু বালি, বালির সমুদ্র। না আছে গাছ, না লতা-পাতা, শুধু খাঁ খাঁ করে বালুকাময় মরুভূমি। রৌদ্রতপ্ত বালুকা থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে আগুনের শিখা। বিশ্বসৃষ্টি পুড়িয়ে ছাই করে দেবার জন্য ব্যগ্র। দুস্তর এই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তবে মক্কেশ্বর দর্শন। ভক্তের আন্তরিকতার অগ্নিপরীক্ষা।

এ অগ্নিপরীক্ষার জন্য মানুষ উন্মুখ। যুগে যুগে মানুষ এ পরীক্ষা দিয়ে এসেছে, আজও দেয়। কেউ উত্তীর্ণ হয়, কেউ হয় না। পথের পাশেই পড়ে মরে থাকে। শৃগাল, শকুনে টেনে ছিঁড়ে খায়। তীর্থযাত্রীরা পথ চলতে অহরহ এ দৃশ্য দেখে, তবু তাদের চলার গতি রুদ্ধ হয় না। কি সেই আকর্ষণ যার জন্য সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে মানুষ এগিয়ে চলে? কার সে বাঁশির ডাকে সাড়া দিতে মরণকে পর্যন্ত তুচ্ছ করতে দ্বিধা করে না!

লোকনাথ এগিয়ে চলেন। মরুভূমির পথে দেখতে পান ধ্যানমগ্ন এক যোগীকে! তাঁর দেহপ্রভায় প্রকাশ পায় অন্তরের ঐশ্বর্য—অনেক মূল্য দিয়ে খরিদ করা। জহুরী বেড়িয়েছে জহর অন্বেষণে। লোকনাথ দাঁড়িয়ে পড়েন। তাঁর কাছে জানতে চান পথের সন্ধান, কিন্তু যোগী নির্বিকার। বারবার প্রশ্ন চলতে থাকে তবুও কোন সাড়া নেই। ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ত! কিন্তু লোকনাথ ধৈর্য হারান না। পাকা ব্যবসায়ী। ধৈর্য হারালে কি চলে? তিনি ক্রেতা, তিনি প্রার্থী। ধৈর্যই তাঁর ব্যবসায়ের মূলধন। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। মুখ খোলেন আব্দুল গফুর।

—তুমি কদিনের লোক?—প্রশ্ন শুনে লোকনাথ বিস্মিত। প্রশ্নের মর্মার্থ ঠিক ধরতে পারেন না। এ কি বয়স জিজ্ঞাসা, না কত

জন্মের কথা স্মরণ আছে তাঁর সেই প্রশ্ন? লোকনাথ নীরব, চিন্তামগ্ন। পুনরায় একই প্রশ্ন:

—তুমি কদিনের লোক? লোকনাথ বুঝলেন মহাপুরুষ জিজ্ঞেস করছেন তাঁর বয়স নয়, তাঁর জাতিস্মরতার কথা।

—দুদিনের। লোকনাথ উত্তর করেন।

—আমি চারদিনের। বলেন বৃদ্ধ আব্দুল গফুর। তিনি দু'জন্মের কথা স্মরণ করতে পারেন, গফুর পারেন চার জন্মের কথা।

তারপর দু'জনের কত কথা! পরস্পরের পরিচয়ের আদান-প্রদান। এ জন্মে আব্দুল গফুর দাক্ষিণাত্যের কোন এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মেছেন। জন্মের পর এ পর্যন্ত চারশ বছর অতীত হয়ে গেছে।

সমাজ বন্ধনের অতীত এঁরা। ধর্ম নিয়ে কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। শুধু সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যখন যেখানে যে সমাজে থাকেন সেখানকার ভাবধারার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেন। মুসলমান নাম গ্রহণ করে মুসলমান সমাজে গফুর রয়েছেন অসংখ্য মুসলমান ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে। লোকনাথ তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

কত যত্ন! মুখে কাপড় বেঁধে লোকনাথের জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে খাওয়ালেন। খাদ্যাবশিষ্ট ভক্তরা গ্রহণ করে নিজেদের কৃতার্থ মনে করলেন। প্রকৃত ভক্তের কাছে মহাপুরুষের আবার জাত ধর্ম কি?

লোকনাথের সাধন ক্ষমতা দেখে আব্দুল গফুর বিস্মিত। এত অল্প সময়ে এতখানি সাফল্য শিষ্যের কৃতিত্ব সন্দেহ নেই, কিন্তু গুরুর কৃতিত্ব এর চাইতে বেশি। পাকা সোনা পিটিয়ে অলঙ্কার তৈরি করেছেন স্বর্ণকার। গফুরের কণ্ঠে ক্ষোভ।

তুমি পাকা লোকের হাতে পড়েছিলে! ধন্য তোমার গুরুভাগ্য!

এমন গুরুভাগ্য আমার হয়নি। মক্কেশ্বর যাওয়ার পথে মরুভূমির মধ্যে আব্দুল গফুরের সঙ্গে দেখা। সেখান থেকে তিন মাসের পথ মক্কেশ্বর। মরুভূমির মধ্য দিয়ে রাস্তা। কি মনে হল, এখান থেকে তাঁরা ফিরে চললেন মহাপ্রস্থানেব সংকল্প করে সুমেরুর পথে।

হিমালয়ের শীত সহ্য করার মত দৈহিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। তাই কেদারতীর্থে রইলেন তিন বৎসর। এর পর শুরু হল তাঁদের মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা। যে পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে যুধিষ্ঠির পৌঁছেছিলেন স্বর্গে।

দশ বৎসর তাঁরা ক্রমাগত উত্তর দিকে চলতে থাকেন। শেষে এমন এক স্থানে পৌঁছান যেখানে সূর্যের প্রবেশ অধিকার নেই। নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা।

কিছু দিন সেখানে থাকার পর ব্রহ্মচারীদের আশ্চর্য রকম দৃষ্টি শক্তি লাভ হয়। অন্ধকারে তাঁরা বেড়ালের মত দেখতে পেতেন।

তাঁরা সম্পূর্ণ অনাবৃত-দেহ, উলঙ্গ। প্রকৃতির অনুগ্রহের দান দেহের উপর শ্বেতবর্ণ উপচর্ম—পাহাড়ের প্রচণ্ড শীতের আক্রমণ থেকে বর্মের মত রক্ষা করছে।

বামনদের দেশ সেটা। এক থেকে দেড় হাত পর্যন্ত তাদের শরীরের উচ্চতা। অনাবৃত উলঙ্গ। দেহের বর্ণ শুভ্র। এদের ভাষা ব্রহ্মচারীরা বুঝতে পারতেন না।

প্রথম কিছু দিন এই বামনের দেশের লোকেরা অদ্ভুত দর্শন তিনটি প্রাণীকে ভয়ে এড়িয়ে চলত। কিন্তু ক্রমে যখন দেখল যে এঁরা কাউকে হিংসা করেন না তখন এঁদের অতিথির মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করল। ফলমূল আহরণ করে অতিথিদের জন্য রেখে যেত।

কিছু দিন অন্ধকারের দেশে বাস করে সুমেরু পথে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব মনে করে তাঁরা প্রত্যাবর্তন করেন।

এই প্রত্যাবর্তনে দশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়। এর পর রওনা

হলেন পশ্চিম দিকে। ইউরোপের পথে। সভ্যতার যে ধারা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষকে আজ বিজয়ী করে তুলেছে সে ধারা মানব জাতির সকল অঙ্গে ঠিক সমান ভাবে পৌঁছায় নি। তাই সুসভ্য শিক্ষিত মানুষের পাশাপাশি আদিম যুগের অরণ্যচারী অসভ্য মানুষেরও দেখা পাওয়া যায়।

মানব জাতির প্রথম আবির্ভাব ঠিক কোন্ দেশে হয়েছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। কারো অনুমান আফ্রিকা ও ভারতের দক্ষিণাপথের মধ্যবর্তী এক বিশাল মহাদেশে প্রথম মানব জাতির আবির্ভাব। আবার কারো মতে এশিয়ার হিমালয়ান্তক প্রদেশে অথবা ভূমধ্য সাগর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগে মানব জাতির প্রথম আবির্ভাব হয়। প্রস্তর যুগের পর এখান থেকে মানুষ পৃথিবীর সকল স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ভৌগোলিক ব্যবধান তাদের মধ্যে আনে বিচ্ছিন্নতা এবং এই বিচ্ছিন্ন দলগুলি কালক্রমে বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়। কেউ মোঙ্গলীয়, কেউ আর্য। স্থানীয় জলবায়ুর প্রভাব এবং অন্যান্য ভৌগোলিক কারণে এই সব জাতির আকৃতি, বর্ণ, আচার-ব্যবহার আলাদা। মানুষের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে গ্রাম, নগর, রাজ্য ও সমাজ। কৃষিকার্যের আবিষ্কার সভ্যতার প্রথম ভিত্তি। চাষীই বর্তমান সভ্য মানুষের আদিপুরুষ।

মানুষের নিজের প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে রাখতে হয়েছে যোগাযোগ। এই যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে তৈরি হয়েছে যাতায়াতের পথ। যাতায়াতের এই পথ সব জায়গায় নিরাপদ, সহজ, সুগম নয়। পথের মধ্যে মাঝে মাঝে বিঘ্নও উপস্থিত হয়। পাহাড় উপত্যকা আর বনের ভিতর দিয়ে চলেছে পায়ে চলা পথের এই রেখা।

ব্রহ্মচারীরা চলেছেন পথ ধরে। সব সময়ে বাঁধাধরা রাস্তা

দিয়ে নয়, প্রয়োজন মত তাঁরা তাদের পথ করে নিয়েছেন। এমনি করে চলতে চলতে তাঁরা আটলান্টিক মহাসাগরের পারে এসে উপস্থিত হলেন।

চলার পথে তাঁরা বহু দেশ, নগর, গ্রাম অতিক্রম করে এসেছেন। কত বিভিন্ন রকম জাতির সংস্পর্শে এসেছেন, শুনেছেন নিত্য নূতন ভাষা। বিচিত্র এই পৃথিবী—বৈচিত্র্যেই তার প্রকাশ।

আটলান্টিকের তীরস্থিত দেশগুলি দেখে তাঁরা পূর্বদিকে উদয়াচল দর্শনে রওনা হয়ে চীন দেশে পৌঁছলেন। অভিনব দর্শন তিন মূর্তি দেখে চীনের রাজকর্মচারীদের মনে সন্দেহ হয়, ভয়ও দেখা দেয়। সাত পাঁচ ভেবে এঁদের বন্দী করে কারাগারে আটকে রেখে দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে রাজকর্মচারীরা বুঝতে পারেন যে, এরা ভারতবর্ষীয় তিনজন মহাপুরুষ—বহুদিন হিমময় দেশে থাকায় শরীর বরফের মত হয়েছে এবং তাঁদের ছেড়ে দেন। মুক্ত হয়ে তাঁরা চীন ছেড়ে চলে আসেন। এ সময়ে হিতলাল মিশ্র একদিন লোকনাথ ও বেণীমাধবকে বলেন: তোমাদের নিম্নভূমিতে কাজ রয়েছে, তোমরা আমার সঙ্গ ছেড়ে সেখানে যাও।

মহাপুরুষের আদেশে লোকনাথ ও বেণীমাধব পাহাড়ের পথ বেয়ে নিম্নভূমি বঙ্গদেশের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। হিতলাল চললেন উদয়াচলের পথে।

পট পরিবর্তন হল।

দিনের পর মাস, মাসের পর বছর। চলার বিরাম নেই। চলতে চলতে দু'জনে এসে উপস্থিত চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। জঙ্গলের এক বৃক্ষমূলে দুই বন্ধু বিশ্রামরত। হঠাৎ শোনা গেল পাহাড়ের বনভূমি প্রকম্পিত করে বাঘের গর্জন। একবার দুবার নয়, বারবার। গর্জন শুনে লোকনাথের কৌতূহল হল।

তিনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। ধ্যান যোগে দেখলেন, ব্যাঘ্র নয়, ব্যাঘ্রী। এবং সদ্যপ্রসূতা। নতুন প্রসূতি, সন্তানদের পরিচর্যার কোন জ্ঞান নেই তার। তার উপর ক্ষুধার্ত। বাচ্চাদের ফেলে খাদ্য অন্বেষণে যেতে মন সরছে না অথচ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করাও কষ্টকর।

এদিকে আর এক চিন্তা। নূতন দু'জন অভিনব জীব নিকটেই উপস্থিত। কে জানে এদেরই বা কি মনের ভাব—শত্রু না মিত্র কে বলবে? সুতরাং ভয় ও ভাবনায় বাঘিনী অস্থির।

ব্রহ্মচারী এগিয়ে এলেন তার সমস্যার সমাধানে। আকার ইঙ্গিতে লোকনাথ বোঝালেন তাঁর মনের কথা। বাচ্চাদের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার নিচ্ছেন তিনি, নির্ভাবনায় ব্যাঘ্রী খাদ্যান্বেষণে যেতে পারে। বনের পশু বুঝল মানুষের মনের কথা। ভাষার মাধ্যমে নয়, সহৃদয়তা ও করুণার অভিব্যক্তি গড়ে তুলল পরিচয়ের যোগসূত্র।

এমনি ভাবে দিনের পর দিন চলল পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান। লোকনাথ ব্যাঘ্র-সন্তানদের সাময়িক দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছেন ও বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বাঘিনী খাদ্যান্বেষণে যাবার আগে গর্জন করে লোকনাথকে জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—চললুম বাচ্চাদের রেখে। ফিরে এসে আবার জানিয়ে দিচ্ছে—ধন্যবাদ তোমার কাজ শেষ হয়েছে, আমি বুঝে নিয়েছি বাচ্চাদের।

এভাবে বেশ কিছুদিন চলল—যে পর্যন্ত না বাচ্চারা সক্ষম হল মায়ের সঙ্গে শিকারে বের হতে।

এবারে বিদায়ের পালা। লোকনাথ যে দায়িত্ব গ্রহণ করে-ছিলেন সে দায়িত্ব তাঁর শেষ হয়েছে, তাই বিদায় নিয়ে বন্ধুসহ বন ত্যাগ করে চললেন। ব্যাঘ্রী তার বনের ভাষায় গর্জন করে জানাল অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

বিদায় বন্ধু, বিদায়, তোমার দয়ার ঋণ কোন দিন ভুলব না।

পাহাড়ের বন্ধুর পথে চললেন দুই বন্ধু। কবে কোন্ শৈশবে মিলেছিলেন দু'জন—শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোর, কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবন, তারপর প্রৌঢ়ত্ব—কোন অবস্থাতেই দু'জনের মধ্যে একদিনের জন্যও বিচ্ছেদ হয়নি। ধর্মে, কর্মে, ভ্রমণে, সুখে দুঃখে—সর্ব অবস্থাতে লোকনাথ ও বেণীমাধব পরস্পরের সাথী। জন্ম থেকে উভয়ের মধ্যে প্রীতির যে বন্ধন সৃষ্টি হয়ে এই পরিণত বয়সাবধি নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার ভেতরেও অটুট রয়েছে কোন দিন কোন অবস্থাতে হয়ত তার ব্যতিক্রম হবে না। পরস্পরের সাহচর্যে আসবে না ছেদ! কিন্তু কে জানে জীবনের শেষ দিন অবধি কি না? এমন ধারণা স্বাভাবিক।

কিন্তু সৃষ্টির রহস্য অসীম। চিরন্তন বলে সেখানে কোন কিছু নেই। নেই সেখানে অভাবনীয় বলে কোন কথা।

বহু দিন পরে দুই বন্ধুর মধ্যে নেমে এল বিচ্ছেদের ঘন-অন্ধকার। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায়ের কাল-সন্ধ্যা।

কর্তব্যের অনুশাসন নির্মমভাবে গড়ে তুলল অভেদ্য প্রাচীর—উভয়ের সাহচর্যে, আবাল্য বন্ধুর চিরসঙ্গতায়।

বিদায়ের মুখে উভয়ে উভয়ের বক্ষলগ্ন—মুখে নেই ভাষা।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের শিখরদেশে বন্ধু লোকনাথকে রেখে বেণীমাধব চললেন কামাখ্যার পথে, একা—টেনে দিয়ে চিরবিচ্ছেদের যবনিকা।

দাবানল। পাহাড়ের বনে লেগেছে আগুন। বাতাসে ভর করে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে বন থেকে বনান্তরে। গগনস্পর্শী লেলিহান অগ্নিশিখা। পাহাড় হয়ে উঠছে উত্তপ্ত। ভয়বিহ্বল পশু-পাখি, হিংস্র জীবজন্তু ছুটোছুটি করছে প্রাণভয়ে—নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। চারদিক থেকে ভেসে আসছে কাতর আর্তনাদ।

হিন্দুর পুণ্যতীর্থ চন্দ্রনাথ দর্শনার্থী এক সাধু তখন গভীর বন-প্রদেশে ভগবৎ-চিন্তায় নিমগ্ন। প্রলয়ের এই আর্তনাদে ভেঙে গেল তাঁর সমাধি। প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখেন বনের চারদিকে আগুন। নির্বাপণের কোন পথ খোলা নেই। উপায়? উপায় ভগবান। সর্ববিঘ্নবিনাশন ভগবানে আত্মসমর্পণ করে তিনি পুনরায় চক্ষু মুদিত করলেন।

হে প্রভু বিপদেও তুমি, সম্পদেও তুমি। ধ্বংসের ভিতরও প্রকাশিত তোমার করুণা। জীবনের মেয়াদ যদি ফুরিয়েই থাকে, শেষ হয়ে থাকে যদি জীবনের প্রয়োজনীয়তা তবে দাবানলে পুড়ে তা নিঃশেষ হয়ে যাক। পঞ্চভূতে মিশে যাক পঞ্চভৌতিক এই দেহ। অগ্নিশিখার ভিতর দিয়ে জেগে উঠুক তোমার করুণাময় স্নেহ-শীতল হস্তের স্পর্শ। আর্তনাদের ভিতর জেগে উঠুক তোমার মঙ্গলময়-শঙ্খনিনাদ।

কিন্তু একি! সত্যি কি ভগবান শুনতে পেয়েছেন তাঁর প্রার্থনা। সত্যি কি তিনি আর্তের জীবন রক্ষার জন্য এসেছেন করুণাময় হস্তের স্পর্শে অগ্নিতপ্ত-দেহ শীতল করে দিতে!

সাধুর বিশালদেহভার বুকের উপর তুলে ধরে দেবতা বেরিয়ে এলেন তীরবেগে দগ্ধমান বন-প্রদেশ থেকে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন হাজার ফিট নীচে শীতল মৃত্তিকায়।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল সব কিছু। ব্রহ্মচারী বেশে দেবতার আবির্ভাব ও অন্তর্ধান এত আকস্মিক যে না হল তাঁর কোন সন্ধান—না হল তাঁর হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। সাধু প্রাণ ফিরে পেলেন। সাধু বিজয়কৃষ্ণ। নদীয়ার গোস্বামী বংশের কুল প্রদীপ। ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর হৃদয়ে অগ্নির অক্ষরে লেখা হয়ে রইল এই ঘটনা, ভবিষ্যতে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তির সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য।

দাউদকান্দি।

ত্রিপুরা জেলার একটি গ্রাম। গ্রামের ভেতর থেকে যে রাস্তাটা মাঠের দিকে চলে গেছে তারই পাশে একটি গাছরতলায় বসে সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক ব্যক্তি। রৌদ্র, জল, বৃষ্টি উপেক্ষা করে বসে আছেন নির্বিকার ভাবে। তাঁর দেহবর্ণ শুভ্র। মাথায় প্রকাণ্ড জটা ও মুখমণ্ডল শ্বেত শ্মশ্রু সমন্বিত। চলার পথে সহজেই চাষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তারা বুঝল এ ব্যক্তি তাদের মত সাধারণ একজন নয়। সহজাত সংস্কারে তারা বুঝল এ সংসারত্যাগী মহাপুরুষ। তাঁর নির্বিকল্প ভাবের কোন ব্যাঘাত না করে তারা দূর থেকে মহাপুরুষকে প্রণাম জানাত—গরিব কৃষকের সাধ্যায়ত্ত ফলমূল উপহার দিয়ে জানাত তাদের আন্তরিক ভক্তি। চাষী ভক্তদের দান মহাপুরুষ সাদরে গ্রহণ করতেন। তাঁর প্রয়োজন মত যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করে বাকীটা বিলিয়ে দিতেন চাষীদের ভেতরেই। দেবতার প্রসাদ মনে করে ভক্তরা তা মাথায় তুলে নিত। নিজেরা খেত, পড়শীদেরও বঞ্চিত করত না প্রসাদের ভাগ থেকে।

এমনি করে মহাপুরুষের আবির্ভাবের কথা গ্রামবাসীদের ভেতর প্রচারিত হল। ডেঙু কর্মকার প্রবাসী এক ব্যক্তি। দেশ ঢাকা জেলায়, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন বারদী গ্রামে। বিষয় কর্মোপলক্ষে সে বাস করে দাউদকান্দিতে। লোকমুখে শুনেছে মহাপুরুষের আগমন কাহিনী। কিন্তু বিষয়ী লোক, এখন পর্যন্ত দেখার সুযোগ হয়নি তার। বিষয়কর্মের নানা ঝঞ্ঝাটে সাধু-সন্ন্যাসীর খোঁজ খবর নেওয়ার সময় কোথায়?

কিন্তু একদিন তার সময় হল। নিজের প্রয়োজনের তাগিদে মহাপুরুষকে একবার দর্শন করতে এল।

কিছুদিন ধরে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িত হয়ে পড়েছে ডেঙু কর্মকার। অর্থবল, মানুষের যথাসাধ্য সাহায্য কোন কিছুই

তাকে যেন আর রক্ষা করতে পারছে না। নিজের পুরুষকারের উপর সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এখন দৈববল ছাড়া আসন্ন জেল থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোন পথ নেই।

কিন্তু দৈববল লাভের উপায় কি? এমন কী সৎকর্ম জীবনে সে করেছে যার ফলে স্বর্গ থেকে নেমে আসবে দেবতার আশীর্বাদ— সঙ্কটের হাত থেকে তাকে ত্রাণ করবে। সঙ্কটভয়ে ভীত ডেঙুর হৃদয়ে জেগেছে কৃতকর্মের অনুতাপ, দেবতার করুণা লাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রাণে জেগেছে আকুলতা।

আকুল হয়ে না ডাকলে আমিত্ব ত্যাগ না করলে আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হয় না। পাষাণ দেবতার প্রাণে জাগে না কোন সাড়া। দ্রৌপদীর মত দুহাত তুলে জানাতে হবে আবেদন নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে। তবে হবে লজ্জানিবারণ, আসরে অবতীর্ণ হবেন সঙ্কট-দুঃখ-ত্রাতা।

ডেঙুর প্রাণে জেগেছে সেই আকুলতা, অসহায়ের সহায় দুর্বলের বল ভগবানের অনুগ্রহ লাভের জন্য তার প্রাণ কেঁদে উঠেছে। —রক্ষা কর প্রভু, দীনদয়াল, অগতির গতি করুণাময় ভগবান।

ভগবানের কানে পৌঁছেছে সে ডাক, ডেঙুর মনে জেগে উঠেছে মহাপুরুষ দর্শনের অভিলাষ।

ভগবান আবির্ভূত হন কোন কিছু উপলক্ষ করে। কে জানে এই মহাপুরুষ সেই উপলক্ষ কি না? অন্ধকারে আলো জ্বলে উঠল। সে আলোর রেখায় ডেঙু পেল পথের সন্ধান। অকূল সমুদ্রে কাষ্ঠখণ্ড—হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইল ডেঙু।

ভোর না হতেই ডেঙু মহাপুরুষের পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত। যুগল চরণে মাথা নত করে রইল। দেবতার আশীর্বাদ না হলে সে মাথা এ জীবনে আর তুলবে না। এমনি দৃঢ়পণ!

মহাপুরুষের দয়া হল। তাঁর মুখের উপর ফুটে উঠল করুণার মৃদু হাসি। তাই আশ্রিতকে শোনালেন অভয়বাণী।

'ভয় নেই, আজই বিচারে তুমি খালাস হবে। তোমার বিপদ কেটে গেছে। দেবতার বরাভয় পেয়েছ।' মাথা তুলে দাঁড়াল ডেঙ্গু। কিন্তু সংশয়ী মানুষের মন, সন্দেহ যেন যেতে চায় না মন থেকে। তবু মহাপুরুষের পদধূলি নিয়ে সে অগ্রসর হল কাছারীর পথে। সন্দেহ-দোলায়িত মন। বারবার পথে যেতে যেতে প্রার্থনা করছে, দেবতা তোমার বরাভয় বাণী যেন সফল হয়। দৈব বল থেকে যেন শ্রদ্ধা না হারাই। এই সংসারের দুঃখ আঘাতের মধ্যেও যে শোনা যায় তোমার বীণার ঝঙ্কার, পাওয়া যায় তোমার করুণার আশ্রয়, অবিশ্বাসী মনের সংশয়ের চির সমাধান হোক। পাপময় সংসারে বেজে উঠুক ধর্মের জয় জয়কার।

মহাপুরুষের আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়নি। খালাস পেয়েছে ডেঙ্গু কর্মকার। তার সমস্ত বিপদমুক্তি হয়েছে।

এবার ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ল মহাপুরুষের পদপ্রান্তে। 'হে প্রভু, অজ্ঞান আমি, পাপী আমি, তাই তোমাকে চিনতে পারিনি। মনে জেগেছিল কত সন্দেহ। কিন্তু সে সন্দেহ দূর করেছ তুমি, আজ নিরসন করেছ সমস্ত সংশয়। আমার অপরাধ ক্ষমা কর ভগবান। আমাকে দয়া কর।

এতই যখন করেছ পূর্ণ কর আমার আর একটি আকাঙ্ক্ষা। আমার দেশে, আমার গৃহে তোমার পূত চরণের ধূলি দিয়ে আমার দেশবাসীকে, আমাকে কৃতার্থ কর। তোমার পুণ্য প্রভাবে কেটে যাক আমার দেশবাসীর সমস্ত দুঃখ কষ্ট, মনের মালিন্য। ধর্মের বিমল জ্যোতিতে ভরে উঠুক বারদীর আকাশ বাতাস। দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ুক তার যশ, তার পুণ্য প্রভা।'

ভক্তের আকুল আবেদন মহাপুরুষের প্রাণে সাড়া দিল। দেব-দুর্লভ হাসিতে ভরে উঠল মুখ। ইঙ্গিতে জানালেন সম্মতি।

ক্ষুদ্রকে উপলক্ষ করে মহতের আবির্ভাব।

মহাপুরুষ লোকনাথ ডেঙ্গু কর্মকারকে উপলক্ষ করে আবির্ভূত হলেন বারদী গ্রামে। সবার অগোচরে, নিজেরও অজ্ঞাতে ডেঙ্গু প্রতিষ্ঠিত করল এক আলোকবর্তিকা—যার প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল সমস্ত বাংলা। বারদী হয়ে উঠল তীর্থস্থান।

বারদী। পূর্ব বাংলার এক নিভৃত গ্রাম। সে গ্রামে ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত ইতর ভদ্র নানা রকম লোকের বাস। অর্থ সম্পদে নাগ মহাশয়েরা গ্রামের প্রধান, সম্মানিত ঘর, সকলে মানে। লোকনাথ ডেঙ্গু কর্মকারের বাড়িতে থাকেন। মাঝে মাঝে গ্রামের পথে বার হন দিগম্বর হয়ে। গ্রামবাসীরা পাগল মনে করে। জাত সম্বন্ধেও তাদের ধারণা ভাল নয়। ভদ্র শিক্ষিত যারা তারা গালাগাল দেয়। দুরন্ত ছেলেরা উত্যক্ত করে তোলে দূর থেকে ইঁট পাটকেল ছুঁড়ে।

লোকনাথ প্রায় সময় নীরবে সে আঘাত সহ্য করেন। কখনো বা আত্মরক্ষার জন্য ঝোপ জঙ্গল বা গাছের আড়ালে যান। এমনি করে কাটে কিছু দিন। কেউ তাঁকে বুঝতে পারে না।

একদিন লোকনাথ উদ্দেশ্যহীন পথে ঘুরতে ঘুরতে দেখেন দুটি ব্রাহ্মণ একস্থানে বসে যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি দিচ্ছেন। কিন্তু সুতোগুলো বার বার জড়িয়ে যাওয়ায় না পারছে তা খুলতে, না হচ্ছে তাদের গ্রন্থি দেওয়া। উভয়ের মধ্যে এই নিয়ে বেঁধেছে কলহ। দুজনে দুজনকে দোষারোপ করছে।

দুজনের ঝগড়া দেখে লোকনাথ এগিয়ে যেতেই ব্রাহ্মণেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অন্ত্যজ এই পাগলের ছোঁয়া লেগে জাত যাবার ভয়ে তাই একজন বলে উঠলেন :

—এই পাগলা ছুঁসনে ছুঁসনে। পৈতেয় গ্রন্থি দিচ্ছি। ছুঁলে একেবারে ভস্ম হয়ে যাবি।

লোকনাথের মুখে ফুটে উঠল হাসির রেখা। বললেন :

—বামুনত বটেই! কিন্তু তোমাদের কি গোত্র গা?

অবাক বিস্ময়ে মুখ তুলে চাইলেন ব্রাহ্মণ দুটি। অন্ত্যজ পাগলের মুখে গোত্র সম্পর্কে প্রশ্ন শুনে। অভিমান ত্যাগ করে একজন জবাব করলেন :

—কাশ্যপ গোত্র।

তোমাদের তিন প্রবর—কাশ্যপ, অপ্সর, নৈধ্রুব, তাই না?

ব্রাহ্মণদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা নেই। উলঙ্গ একটা পাগলের মুখে ব্রাহ্মণের গোত্র প্রবরের সঠিক তথ্য অবগত হবেন এ তাঁদের কল্পনাতীত। মনের ভিতর জেগে উঠল একটা সন্দেহ। ছাই ঢাকা মাণিক বুঝি। কে জানে কোন মহাপুরুষ কিনা? আত্ম-গোপনের জন্য ধরেছেন পাগলের বেশ, হীন জাতির অন্ন করছেন গ্রহণ। সম্ভ্রমে উভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

লোকনাথ বললেন,

—পৈতেয় গ্রন্থি দিচ্ছিলে না?

—দিচ্ছিলুম, কিন্তু সুতোয় প্যাঁচ লেগে গেছে।

—কি করে খুলতে হয় জান না?

—জানি, গায়ত্রী জপ করে।

—তবে তা করছ না কেন?

—আজ্ঞে আপনি যদি দয়া করে—

মৃদু হেসে লোকনাথ বললেন :

—টেনে দেখ খুলে গেছে।

অদ্ভুত! ব্রাহ্মণেরা বিস্মিত হয়ে দেখেন সুতোর প্যাঁচ খুলে গেছে। শ্রদ্ধায় তাঁদের মন ভরে উঠল। কিন্তু তাঁদের শ্রদ্ধা

জ্ঞাপন করার জন্য মুখ তুলতেই দেখেন পাগল চলে গেছে। এতদিন হীন অন্ত্যজ বলে যাকে ঘৃণা করেছেন, পাগল বলে অবহেলা করেছেন, সে যে সাধারণ কেউ নয়, আত্মগোপনকারী কোন মহাপুরুষ—এ বিষয়ে তাঁদের আর সন্দেহ রইল না। ভয়ে ভক্তিতে তাঁদের মনে জেগে উঠল এক নূতন চেতনা। অভাবনীয় বস্তু আবিষ্কারের আনন্দে মন ভরে উঠল। দেশবাসীর কানে কতক্ষণে তাঁরা পৌঁছাবে এ সংবাদ।

গ্রামের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল এ খবর। কেউ বিশ্বাস করল কেউ করল না। যদিও লোকের মনে আগেকার সে অশ্রদ্ধা নেই। তারা একে একে এসে জুটল মহাপুরুষকে দেখার জন্যে। সেই সঙ্গে কেউ চায় রোগের ওষুধ, কেউ জানায় মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভের জন্য প্রার্থনা।

সমাজে নিম্নস্তরের লোক এরা। এদের অভাব শিক্ষার, অভাব অর্থের। চির দারিদ্র্য—রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণায় জর্জরিত। ঐহিকের এত অভাবের ভেতর পড়ে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে। পারলৌকিক চিন্তার কথা মনে স্থান দেবার সুযোগ কোথায়? রোগে ওষুধের প্রয়োজন। কিন্তু পয়সা কোথায়? তার চেয়ে সাধুর হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে একটু চরণধূলি কি জঙ্গলের গাছ-গাছড়ায় যদি রোগ সেরে যায় তা হলে কেন তারা তা চাইবে না।

দিনের পর দিন ভিড় বেড়ে যেতে লাগল। দীনের দেবতা লোকনাথ। ছোটদের প্রাণের ঠাকুর। তাইত তিনি স্থান নিয়েছেন তাদেরই ঘরে যারা সমাজে অবজ্ঞাত, অবহেলিত। গরিবের মর্মবেদনা তাঁর প্রাণে তুলেছে সাড়া। তাই তিনি কাউকে ফেরান না। দু'হাত তুলে তাদের দেন বরাভয়—রোগ, শোক, বিষয় সম্পত্তির গোলযোগে তাদের কামনাকে পূর্ণ করেন।

এ যেন এক কল্পতরু। বিফল হয়ে কেউ ফিরে যায় না! দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল এ খবর। গ্রামের জমিদার নাগ মশাইদের কানেও পৌঁছল খবরটা। আভিজাত্যের অভিমান এক বারে ত্যাগ করা যায় না। সবাই না এলেও ছ'একজন করে তাঁদের কেউ কেউ এগিয়ে এলেন। মধ্যম হিস্যা ও পশ্চিমের হিস্যার মালিকেরা লোকনাথকে বারদী গ্রামে আশ্রম করে থাকবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

লোকনাথ রাজী হলেন। বাজারের পুবদিকে একটুকরো স্থান অনেক দিন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। কেউ কেউ মাঝে মাঝে সেখানে শবদাহ করত। এই জায়গাটি আশ্রমের জন্য নির্বাচিত হল। খাজনাপত্র কিছু দিতে হবে না। নিষ্কর এই জমির উপর লোকনাথের আশ্রম গড়ে উঠল। শুরু হল লোকনাথের লীলার আর এক নব অধ্যায়। তিনি নিলেন লেংটি, বহির্বাস এবং যজ্ঞোপবীত। সন্ন্যাসী হলেন গৃহী, অসামাজিক হলেন সামাজিক – সমাজের নিয়ম কানুনের অধীন, লোকশিক্ষার কারণে। সেই থেকে নামকরণ হল—বাবা লোকনাথ।

ভক্তদের ভিড়। সাধু দর্শন করতে আসে তারা। শুধু হাতে কি সাধু দেখা যায়, না দেখা উচিত? তাই সাধ্যানুসারে কেউ এনেছে নিজের গাছের আম, কাঁঠাল, বেল; কেউ ছুধ, কেউ দই, ক্ষীর, ননী। যার যেমন সঙ্গতি। প্রায় সকলেরই কোন না কোন কিছু উপলক্ষ করে মানত করে রাখা। কার গাছে আম হয় না। রেখে দাও গোঁসাইএর নামে মানত করে। পর বছর গোঁসাইএর কৃপায় গাছে এল ফুল, হল ফল। গৃহস্থের আনন্দের সীমা নেই।—সাক্ষাৎ দেবতা গো, পাপী তাপী উদ্ধার করতে এসেছেন।

কারোর আবার পাটোয়ারী বুদ্ধি। বাবার ক্ষমতা পরীক্ষা করতে হবে। এই পরীক্ষার মনোভাবের ভিতর নিজের স্বার্থের

চেয়েও অন্যের কাছে লোকনাথের মহিমা প্রচারের আকাঙ্ক্ষা। তাই ভয়ে ভয়ে মানত করল—দেখ বাবা, তোমার নামের যেন কলঙ্ক না হয়। গাছটায় অসময়ে একটি কাঁঠাল দিয়ে আমার মুখ রক্ষা কর।

সত্যি ফলে উঠল অসময়ে গাছে কাঁঠাল। মানতকারিণীর মুখে জয়ের উল্লাস। দেবতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি। পাড়া-পড়শীদের ভিড় লেগে গেল। যে শোনে সেই ছুটে আসে দেখতে। যথাসময়ে কাঁঠাল পাকল। প্রতিবেশীদের নিয়ে মানতকারিণী এসেছে দেবতার দেওয়া জিনিস দিয়ে দেবতার পূজা দিতে।

ভিড়ের মধ্যে একটি বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে হাতে এক ভাঁড় দুধ। লোকনাথের নাম শুনেছে সে, কিন্তু দেখেনি। কি নিয়ে দেখতে আসবে? ঘরে আছে একটি মৃতবৎসা গাই। বর্তমানে আসন্ন-প্রসবা। ঠাকুরের নামে রেখে দিল।

ভালোয় ভালোয় যেন প্রসব হয় ঠাকুর, তোমাকে পূজা দেব।

বৃদ্ধার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। ভালোয় ভালোয় প্রসব হয়েছে। হয়েছে একটি বক্না। বৃদ্ধার মনে আর আনন্দ ধরে না। কতদিনে সে দেবে এবার দেবতার পায় পূজা। মনে মনে দিন গুনছে। আজ সেই শুভদিন। তাই এসেছে দুধ নিয়ে মানত শোধ করার মানসে।

কিন্তু, একি! কে এই সাধু?" এঁকে দেখে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠছে কেন? মনে হচ্ছে কোথায় যেন এঁকে দেখেছে। এ যেন তার কত আপনার। হারিয়ে পাওয়া সাত রাজার ধন এক মাণিক। বৃদ্ধার বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভেতরে কি যেন হয়ে যায়! স্তন মুখে নেমে আসে ক্ষীরের ধারা। পুত্র বাৎসল্যে ভরে ওঠে বুক। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না। মন চায় ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে, চায় বুকে তুলে বুভুক্ষিত অন্তরের স্নেহের ক্ষুধা মেটাতে। দেহ কাঁপছে থর থর করে।

বুড়ী পাগল হয়ে যাবে নাকি। কি অসম্ভব কল্পনা মনে। সিদ্ধ এক মহাপুরুষ, বহুজন পূজিত গণ্য-মান্য ব্যক্তি, তাঁকে চায় বুকে জড়িয়ে ধরতে, সন্তান বলে সম্ভাষণ করতে।

গোয়ালার মেয়ে সে, স্বামী পুত্রহীনা, অসহায়া—আছে গ্রামের এক প্রান্তে পড়ে। কোনো রকমে দিন আনে দিন খায়। শোকে তাপে জর্জরিত। সম্বল একটি গাই। দুধ বেচে কোন মতে দিন কাটে। অভাব অভিযোগে মনের কোনো স্থিরতা নেই, তাই যত অসম্ভব কল্পনা। তার চিন্তার মধ্যেই কে একজন বলে ওঠে:

—কমলা দিদি। গোঁসাইকে দুধ দিলে না?

সম্বিৎ ফিরে আসে। তাইত মানত শোধ করতে এসেছে সে। আসল কথাত ভুলেই গিয়েছিল কমলা। দুধের ভাঁড় নিয়ে কোনো মতে অগ্রসর হল।

চলতে যেন পারে না। পা ভারী হয়ে আসছে। দুধের ভাঁড়টা যেন নিরেট পাথর, বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। কুটিরের কাছে এসে তার পা আর চলে না।

হাত বাড়িয়ে লোকনাথ ধরল দুধের ভাঁড়। বুড়ির অবস্থা দূর থেকে দেখে নিজেই উঠে এসেছেন তিনি।

—মা মণি আমার, এতদিনে ছেলেকে মনে পড়ল? আমি যে কতদিন ধরে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি!

লোকনাথের কথা শুনে কমলার আনন্দ আর বাধা মানল না। পুত্র বাৎসল্যের আবেশে অবশ তনু-মন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন লোকনাথের বুকের উপর। সন্তানকে নিলেন বুকে তুলে।

—বাবা আমার, গোঁসাই আমার।

ভক্তরা দূরে দাঁড়িয়ে উপভোগ করলেন স্বর্গীয় এই দৃশ্য—লোকনাথ চরিত্রের অপার মহিমা। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান।

মায়ের আসনে কমলা প্রতিষ্ঠিতা হলেন। নিলেন লোকনাথের

পরিচর্যার দায়িত্ব—ভক্ত, শিষ্যদের সেবার গুরুভার। দেখতে দেখতে আশ্রমের পরিচালিকা হয়ে গেলেন গোয়ালিনী মা।

লোকনাথ বলেন, আমার গত জন্মের মা। কর্মফলে এ জন্মে গোয়ালার ঘরে জন্মেছেন, সহায় সম্বলহীনা অনাথা।

কর্মফল। কর্ম করলে ফল তার অবশ্যম্ভাবী। সংসার কর্মক্ষেত্র। কর্ম করতেই হবে। 'কায়েন মনসা বাচা।' যে ভাবেই কর্ম করা হোক না কেন ফল লাভ সুনিশ্চিত।

যে ছিল রাজা সে হয় ফকির, পথের ভিখিরী এসে বসে রাজ-সিংহাসনে। সকলের মূলে সেই এক কথা—কর্মফল। ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের গৃহিণী, দেবোপম সন্তানের মা। কোন্ কর্মফলে হলেন গোয়ালিনী মা কে জানে? কবে শুরু হয়েছে কর্মের এই খেলা কবেই বা হবে তার শেষ, বিচিত্র এই লীলা-রহস্যর কে করবে উদ্ঘাটন ?

ভক্তদের নিয়ে বসে আছেন লোকনাথ। বেশির ভাগ ভক্তই ইহলোকের সুখ-সুবিধাপ্রার্থী। সংসারাসক্ত লোকের সাধু দর্শনের ব্যগ্রতা ক্ষণিক ও স্বার্থদুষ্ট। কেউ চায় পারিবারিক শান্তি, ব্যবসায়ে উন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম। এই জাতীয় বহুলোক বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে আশ্রম পূর্ণ করতে লাগল।

লোকনাথ জানে দরিদ্রের মর্মব্যথা। তাদের অসুবিধার কথা—সমাজ জীবনের অব্যবস্থা। তাই শুধু ভক্ত নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন না। সমাজের মঙ্গল চিন্তাও তাঁর অন্তরে স্থান পেয়েছিল। সমাজের নিয়ম কানুন মেনে তার শৃঙ্খলা রক্ষা করার দিকে ছিল তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। গরিবের প্রতি ধনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বরাবর জানিয়েছেন প্রতিবাদ এবং প্রতিকারের জন্যও লড়েছেন প্রাণপণ।

অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী। বালু খুঁড়লে তবে পাওয়া যাবে জল। লোকনাথের কঠোর বাহ্য আকৃতির অন্তরালে ছিল করুণার চির-পবিত্রধারা। আর্তের কাতরতায় পীড়িতের আর্তনাদে, দুঃস্থের মর্ম পীড়ায় করুণার সে ধারায় উঠত তরঙ্গ। কঠোর ব্রহ্মচারী হৃদয়াবেগে ছিলেন সামাজিক মানুষ। তাই তিনি এদের ফেরাতেন না। প্রার্থীদের তিনি বঞ্চিত করতেন না। তাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনতেন এবং প্রয়োজন মত করতেন ব্যবস্থা। যে যেমন উপযুক্ত ব্যবস্থাও হত তার সেরকম।

একদিন কলকাতা থেকে এল এক ব্রাহ্মণ যুবক। মনের অভিলাষ, লোকনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করবে। অন্তর্দর্শী মহাপুরুষ লোকনাথ। এক মুহূর্তেই দেখতে পেলেন যুবকের ছবি। শ্মশান বৈরাগ্য ক্ষণিক—ব্রহ্মচর্যের উপযুক্ত দেহ মনের গঠন এর নয়। তাই উপদেশের ছলে বুঝিয়ে দিলেন, বিবাহ করে সংসার ধর্ম করাই তার পক্ষে প্রকৃত ধর্ম। সমাজেরও কল্যাণ।

ঋষির মেয়ে পেতি। বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। হাবাগোবা। ঋষি যুবকদের লুব্ধ-দৃষ্টি মেয়েটার উপরে অথচ হাবা বলে কেউ বিয়ে করতে রাজী নয়। সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটার সম্ভাবনা। লোকনাথ পেতিকে নিয়ে এলেন আশ্রমে। একটি অন্ধ ঋষি, যুবকের সাথে পেতির বিয়ে দিয়ে দিলেন এবং সামাজিকতা রক্ষার জন্য নিজের খরচায় ঋষি সমাজের লোকদের খাইয়ে দিলেন।

সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই পরস্পরের মুখাপেক্ষী। প্রত্যেকেই সমাজ জীবনের এক একটি অঙ্গ। প্রত্যেকেরই সমাজে দেবার ও নেবার সমান প্রয়োজন আছে। এর ব্যতিক্রম মানেই সমাজের অঙ্গহানি। তাই বারদীর কর্মকারেরা বিবাহের ফর্দ করার

জন্য লোকনাথের কাছে এলে তিনি সেই ফর্দে প্রয়োজনীয় সব কিছুর সঙ্গে এক দফা আতসবাজী লিখে দেন। কর্মকারেরা আপত্তি জানালে তিনি তাতে সায় দেন নি। বাজীওয়ালাও সমাজের লোক। গ্রামের বিবাহাদি শুভকাজে সে বরাবর বাজী সরবরাহ করে আসছে। এটাই তার জীবিকা। তাকে তার জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা মানে সমাজকে পঙ্গু করা।

লোকনাথ বলেন :

—অন্ধসমাজ। চক্ষু থাকা সত্ত্বেও অন্ধের মত চলে।

কৌলীন্য প্রথার উপর ছিল তাঁর বীতরাগ। এই কুপ্রথা সমাজে প্রচলিত থাকায় এক শ্রেণীর লোক পঁচিশটি বিয়ে করতেও কুণ্ঠিত হত না—আবার আর এক শ্রেণীর লোকের অর্থের অভাবে বিয়েই হত না। জাত বিচারের অজুহাতে একে অন্যের হাতে প্রকাশ্যে খায় না অথচ অপ্রকাশ্যে চলে তার ব্যতিক্রম। সমাজের সর্বস্তরে চলছে এই লুকোচুরি। স্বার্থের তাগিদে হেন কাজ নেই যা লোকে না করছে। সমাজ কর্তাদের অগোচর নেই তবু না দেখার ভান করেন। কি প্রয়োজন এই লুকোচুরির? যা সত্য যা সমাজের পক্ষে মঙ্গল তাকে গ্রহণ না করা আত্মহত্যার অপরাধ। সমাজ ব্যবস্থার গোড়ায় গুণ-কর্মের প্রয়োজনে যে জাতি বিভাগ হয়েছিল, আজ যদি তার প্রয়োজন শেষ হয়ে থাকে তাহলে তাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকার ভেতর কি যুক্তি থাকতে পারে? অন্যায়ের সঙ্গে আপস, আত্ম-প্রবঞ্চনা— সমাজ জীবনে গুরুতর পাপ।

লোকনাথ গোয়ালিনী মায়ের হাতে খান। অনেক ব্রাহ্মণের এজন্য আপত্তি। পরোক্ষে এ নিয়ে আলোচনাও হয়। অথচ সেই সব ব্রাহ্মণেরা লোকনাথের দেওয়া অর্থে তাঁর এক শিষ্যের বার্ষিক শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্নগ্রহণ করতে আপত্তি করেন না। শিষ্যের ছেলেরা লোকনাথের প্রসাদ গ্রহণ করেন। তাদের

পরিবেশিত খাদ্য গ্রহণ করতে এদের আপত্তি হয় না। তাই বিদ্রূপ করে লোকনাথ বলতেন:

—ব্রাহ্মণদির বামুনেরা, আমি গোয়ালিনী-মার হাতে খাই বলে আমার নিন্দা করে, কিন্তু ভাজা মাছের লোভে অভয়চরণের বার্ষিক শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খায়।

সেকালে কুলগুরুরা তাঁদের শিষ্যদের মনে করতেন সম্পত্তির মত। তাঁরা জানতেন মন্ত্র দেই আর না দেই শিষ্যেরা হাতছাড়া হতে পারবে না। তাই শিষ্যের কল্যাণ কামনার দিকে নেই তাঁদের দৃষ্টি। এই সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে তাঁরা কলহ করে।

এমনি একজন ভুক্তভোগী রজনীকান্ত সেন। তিনি ছিলেন আগড়তলা মহারাজার 'বডিগার্ড'। ব্রহ্মচারীর নাম শুনে তাঁকে দেখতে এসেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর কাছে মন্ত্র নেবার অসুবিধার কথা বললেন।

লোকনাথ উত্তর দিলেন।

'তুই গুরুদিগকে বলিস—আপনারা শিষ্যসম্বন্ধীয় গোলযোগ মীমাংসা করে আমাকে মন্ত্র দিন। আর যদি গোলযোগ মীমাংসা না করেন তাহলে আমি বারদীর ব্রহ্মচারীর কাছে মন্ত্র নেব—তবেই দেখবি তাঁরা তোকে মন্ত্র দেবে।'

গুরুকে অশ্রদ্ধা নয় অস্বীকারও নয়। তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করার জন্য কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ।

আবার গুরুর মাহাত্ম্য দেখাবার জন্য নড়িয়ার ব্রজনাথ বাঁড়ুয্যেকে উপদেশ দিলেন সাত দিন গুরুর চরণামৃত খেতে। ব্রজনাথের শরীরে কুৎসিত ব্যাধি হয়ে সমস্ত দেহ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে। লোকনাথের আদেশ মত গুরুর চরণামৃত পান করে ব্যাধির নিরাময় হল এবং তাঁর স্বাভাবিক দেহ বর্ণ ফিরে এল। আসলে যদিও

লোকনাথের কৃপাতেই তিনি ব্যাধি মুক্ত হন, তবু দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখালেন গুরুভক্তির অপূর্ব পরিণতি।

সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মানতে হবে তার বিধিনিষেধ কিন্তু সংস্কারের প্রয়োজন বোধ হলে তা করতে হবে যথাসাধ্য শৃঙ্খলা রক্ষা করেই। সংস্কারের নামে ধ্বংসের তিনি বিরোধী। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজনীন। শাস্ত্রীয় শ্লোকের ব্যাখ্যার ভেতর দিয়ে তিনি তা প্রকাশ করতেন। তিনি জানেন সংসারে ধনীরা নিজেদের আমোদ প্রমোদের জন্য যে অর্থ-ব্যয় করে, গরিব দুঃখীদের দুঃখ নিবারণে তার শতাংশের একাংশও করে না। তাই কোন এক ভক্তের প্রশ্নের জবাবে পিতৃ-পুত্রের কর্তব্য সম্বন্ধে বলেন :

—যদি পিতৃ পুরুষকে সন্তুষ্ট করতে হয়,তাদের অক্ষয় স্বর্গ-প্রাপ্তির কামনা থাকে তাহলে পূর্ব-পুরুষদের পিণ্ডদানের সঙ্গে করতে হবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে অন্নদান, দুঃখীর দুঃখ দূর।

শুধু নিজের স্বাচ্ছন্দ্য দেখলেই চলবে না। দেখতে হবে সর্বজনীন সুখ-সুবিধা, সকলের সুখে দুঃখে সমভাগী হতে হবে। হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত ভাব ত এই।

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

বাংলার মহিলা কবির অন্তরের এ বাণী—ভারতীয় সাম্যবাদের আদর্শ। এ শুধু ধনের সমবণ্টন নয়, বড়কে টেনে নীচে নামিয়ে এনে ছোটর সমপর্যায়ে ফেলার সাম্যবাদ নয়, এ হল অন্তরের বণ্টন। কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহের, অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধার, বন্ধুর প্রতি ভালবাসার সমবণ্টন। এ রাজনীতি নয়, ধর্মনীতি; এ বিদ্বেষ প্রচার নয়, সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ।

বিক্রমপুর কেওটখালির অধিবাসী রাজমোহন চক্রবর্তী। ভাওয়াল রাজস্টেটের প্রধান মোক্তার। ধর্ম চিন্তা করতে করতে এমন উগ্র ভাবাপন্ন হলেন যে সকলে তাঁকে মনে করত পাগল। তাঁর ধারণা তিনিই ভগবান। শালগ্রাম শিলা টিলা কিছু নয়, শুধু একটি পাথর। একথা শুধু মুখে বলতেন তা নয় একদিন শালগ্রাম শিলার উপর পা দিয়ে দাঁড়ালেন। স্ত্রীর মনে স্বামীর এই অবস্থা দেখে তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হল। তাই স্বামীকে চিকিৎসার জন্য সে নিয়ে এল লোকনাথের কাছে।

আশ্রমে পৌঁছে তারা ব্রহ্মচারীর কাছে যেতেই কোন ভূমিকা না করে লোকনাথ বললেন :

—আমার কাছে কত দিগ্‌দেশের লোক আসছে, কত লোক কত রকম ফল পাচ্ছে; কিন্তু আমি ত আমাকে ঈশ্বর বলে ভাবি না বা শালগ্রাম শিলার উপর পা দিয়ে সমাজের লোকের মনঃপীড়ার কারণ হই না। কাজেই এ রকম অসঙ্গত কাজ আর কর না, ভবিষ্যতের জন্য তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

চক্রবর্তীর ঈশ্বরত্ব লোপ পেয়ে গেল। রোগের খবর বলার আগেই যে চিকিৎসক রোগ ধরেন ও ঔষধের ব্যবস্থা দেন সে সহজ চিকিৎসক নন। ভগবান্ বলে নিজেকে আর যেখানেই প্রকাশ করা যাক এখানে যে তা চলবে না এটা তিনি ভাল করেই বুঝলেন। রোগের নিরাময় হয়ে গেল এক দর্শনে।

নাগ মহাশয়দের এজমালী মহলে প্রজাবিদ্রোহ। মালিকেরা বলপ্রয়োগে বিদ্রোহ দমনে কৃতসংকল্প। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ একজন অংশীদার আপত্তি জানালেন। বললেন :

—এ বিষয়ে একবার গোঁসাইর নিকট জিজ্ঞেস করা কর্তব্য

কিন্তু অন্যান্য অংশীদারদের এ আপত্তি ও প্রস্তাব মনঃপূত হল না। একজন বললেন :

—নিজেদের জমিদারি নিজেরা রক্ষা করব তার আবার গোঁসাইর পরামর্শ কি ?

আলোচনায় এল মতদ্বৈধতা। বয়োবৃদ্ধরা চান লোকনাথের পরামর্শ, কিন্তু যুবক মালিকদের তাতে আত্মসম্মানে বাধে। হলই বা লোকনাথ সিদ্ধ মহাপুরুষ, জমিদারি পরিচালনার অভিজ্ঞতা তাঁর কি আছে! বংশ পরম্পরায় তাঁরা জমিদার। নিজেদের জমিদারির গোলযোগের ব্যাপারে অন্যের পরামর্শ নেওয়ার মানে নিজেদের অযোগ্যতার প্রমাণ।

কিন্তু তাদের এই আপত্তি টিকল না। বিষয়টি জটিল। কাজেই বৃদ্ধদের কথা অবহেলা করে বিপদের গুরু-দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের কাঁধে নেবার সাহস শেষ অবধি রইল না। গোঁসাইর পরামর্শ নেওয়াই স্থির হল। আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন নাগবাবুরা।

সকলে আসন পরিগ্রহ করতে না করতেই লোকনাথ বললেন, ওরে নিজেদের জমিদারী নিজেরা রক্ষা করবি তা আবার গোঁসাইর পরামর্শ কি ?

বিস্মিত ভীত নাগবাবুরা। ইনি অন্তর্যামী না কি! যে কথা নিজেদের মধ্যে হয়েছে অন্য কাকপাখির জানার পর্যন্ত সাধ্য নেই, সেই কথাটা বলে দিলেন লোকনাথ! বাবুদের মাথা নত হল। নিজেদের অহঙ্কারের জন্য অনুতপ্ত হলেন। ত্রুটি স্বীকার করে জমিদারি সংক্রান্ত গোলযোগের সমস্ত কাহিনী খুলে বললেন।

দয়ার প্রাণ লোকনাথ বাবার। ধীরভাবে তাদের কথা শুনে বললেন, তোদের কিছুই করতে হবেনা, আমার আশ্রম থেকেই তোরা প্রজাদের খাজনা ও কবুলত বুঝে নিবি।

পরামর্শ শুনে নাগবাবুরা ফিরে এলেন। কিন্তু সংশয় তাঁদের কাটল না। বিদ্রোহী প্রজারা আশ্রমে এসে খাজনা ও কবুলত দেবে একথা তাঁদের বিশ্বাস হল না; জমিদারির ইতিহাসে এমন নজীর তাঁদের অজানা; তাঁরা চিরকাল জেনে এসেছেন ছোট-লোকদের সায়েস্তা করতে একমাত্র প্রয়োজন লাঠি। কুকুর আর ছোটলোকদের মধ্যে তফাৎ নেই। প্রশ্রয় দিলে উভয়েই মাথায় ওঠে। বাপ পিতামহের কাল থেকে চলে আসছে এই নীতি, সুতরাং চিরাচরিত নীতি অবহেলা করে কে একজন লেংটা ফকীর কি বলল, তাই গ্রহণ করতে হবে এ ব্যবস্থা চলতে পারেনা। অভিমান মাথা তুলে দাঁড়াল, অনুসৃত হল চিরাচরিত জমিদারি নীতি। লাঠিয়াল এল, হল মারামারি। বিদ্রোহের একজন হল গুরুতরভাবে আহত। প্রজার পাট জোর করে কেটে নিয়ে এলেন জমিদারবাবুরা।

মামলা রুজু হল। কয়েকজন লাঠিয়াল ফৌজদারীতে সোপর্দ হল। বিদ্রোহী পক্ষের একজন গুরুতর আহত হওয়ার সংবাদে নাগবাবুরা ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন মহাপুরুষের আদেশ অমান্য করার ফল ভাল হয়নি। সুতরাং স্থির করলেন লোকনাথের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং এবার তিনি যা আদেশ দেন সেই ভাবেই কাজ করবেন। তাই হল। মহাপুরুষের নিকট করজোড়ে সবাই উপস্থিত। লোকনাথ বললেন :

—প্রথম যা বলেছি মান্য করিসনি, দাঙ্গা করবি জানতে পেরে নিষেধ জানিয়েছি। তোরা এবার আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছিস্ এবং গতকাল বেলা আটটার সময় আমাকে একটা খোঁচা দিয়েছিস, তোদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

শেষ পর্যন্ত লোকনাথ ক্ষমা করলেন। জমিদারদের স্তবস্তুতিতে বাধ্য হলেন রাগ ভুলে যেতে। অবোধ সন্তানদের উপর পিতার রাগ কতক্ষণ থাকে? বললেন :

—পুলিস, দারোগা, আমলা, মোক্তার কাউকে কোন টাকা দিস্ না। আসামী আমার আশ্রম থেকে নিয়ে যাবি।

কিন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমা কি তদ্বির-তালাসি ছাড়া চলে? উকিল দেব না, মোক্তার দেব না আসামীর পক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাই চলবে না অথচ আসামীরা মুক্ত হবে এ অসম্ভব কল্পনা। মহাপুরুষের বাক্যে পুনরায় এল নাগবাবুদের অবিশ্বাস। তাঁরা মোকদ্দমা তদ্বিরের জন্য যথাসাধ্য উকিল মোক্তার নিযুক্ত করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বিচারে আসামীদের ছমাসের জেল হল।

দু'দুবার লোকনাথের আদেশ লঙ্ঘন করে এবার আর তাঁর কাছে যেতে বাবুদের সাহস হল না। তাই তাঁরা ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করলেন। কিন্তু এ সময় নাগবাবুদের হল আর এক বিপদ। আপীলের মোকদ্দমা দায়ের থাকাকালীন আহত ব্যক্তি মারা গেল। ফরিয়াদি পক্ষ চাইল খুনের মামলার বিচার। নাগবাবুদের সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। গুরুতর এই বিপদের ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে বহন করার মতো না আছে তাঁদের সাহস না আছে কোনো যোগ্যতা। আতঙ্কে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার গিয়ে সেই মহাপুরুষের পদতলে লুটিয়ে পড়লেন।

পতিতাকে উদ্ধার করতে, অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করে তুলতে, যুগমানব লোকনাথ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই মাঝে মাঝে তিনি করেছেন তাঁর বিভূতি প্রকাশ। পূর্ণ তমোগুণ ও রজোগুণে বশীভূত বারদীর নাগবাবুদের উপলক্ষ করে লোকনাথের যে শক্তির প্রকাশ হয়েছে তা অলৌকিক। শক্তির এই প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। নাগবাবুদের নিজেদের মধ্যে ছিল দ্বেষ, হিংসা আর দলাদলি। পরস্পরের মধ্যে চিরবিদ্বেষ বিরাজমান। ঠিক এই সময় লোকনাথ তাঁর শক্তির প্রকাশ করে এদের মধ্যে করলেন শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আদর্শ

স্থাপন। নাগবাবুদের যেন চোখ ফুটল। তাঁরা দেখলেন মহাপুরুষের সর্বতোমুখী শক্তির কাছে তাঁদের শক্তি কত অকিঞ্চিৎকর! আত্মাভিমান ভুলে তৎক্ষণাৎ তাঁরা এসে লুটিয়ে পড়লেন মহাপুরুষের পায়ে। আর সেদিন থেকে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কৃপা লাভ করে তাঁরা হলেন ধন্য। বারদীর নাগ মহাশয়দের প্রতাপ ছিল দিগন্তব্যাপী। এই দৃষ্টান্ত দেখে তাঁদের শত সহস্র আশ্রিত লোক এঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করল। লোভী শিখল বৈরাগ্য, ক্রোধী শিখল প্রেম, পুণ্যের বিমলজ্যোতিতে পাপীর হৃদয় হল উদ্ভাসিত। বারদী পরিণত হল এক স্বর্গরাজ্যে!

পতিতপাবন লোকনাথ এবারেও তাঁদের মার্জনা করলেন বটে তবে বারংবার তাঁর কথার অমান্য করার দরুন জমিদারদের প্রত্যেককে একশত টাকা জরিমানা করলেন। তারপর অভয় দিয়ে বললেন:

—যেদিন তোদের আপীলের শুনানী হবে সেদিন বিকেলবেলা তোরা সবাই আমার কাছে আসিস।

মহাপুরুষের অনুগ্রহ লাভ করে আশ্বস্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন নাগবাবুরা। নির্দিষ্ট দিনে আবার উপস্থিত হলেন লোকনাথের আশ্রমে। সকলের মুখে বিষাদের ছায়া, আতঙ্ক কণ্টকিত হৃদয়! কি জানি গোঁসাই আজ কোন্ কথা শোনান কে জানে?

কিন্তু সমস্ত আশংকা দূর করে গোঁসাই শোনালেন তাদের আশার বাণী। তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত বরাভয়। তিনি বললেন:

—জজ অসুস্থ, আমি সেখানে গিয়েছিলাম, এবং তাঁকে ডেকে উঠিয়ে রায় লিখিয়ে এসেছি। কাল খালাসের টেলিগ্রাম পেয়ে যাবি। আসামীদেরও আমার আশ্রমে দেখতে পাবি।

পুলকিত বিস্মিত নাগবাবুরা! শুভ সংবাদের মিথ্যেও বুঝি ভাল। কিন্তু ব্যাপারটা তাঁদের বোধগম্য হল না। গোঁসাই ত

কোন সময় আশ্রম ত্যাগ করে কোথাও যান না। তাহলে কখন তিনি গেলেন আর কিভাবেই বা লেখালেন অসুস্থ জজকে দিয়ে রায়?

সন্দেহ সমাকুল জমিদারদের সমস্ত সংশয় দূর করে তার পরদিন বেলা নয়টায় সত্যি এল টেলিগ্রাম মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত বাণী বহন করে—আসামীরা খালাস হইয়াছে।

পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন :

—"এরা নিত্যসিদ্ধের থাক্। এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। একটু বয়েস হলেই চৈতন্য হয়. আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীব-শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনীকাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না। বেদে আছে হোমা পাখির কথা। এরা সেইরূপ।"

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ নিত্যসিদ্ধের থাক্। নবদ্বীপের বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য অদ্বৈত প্রভুপাদের বংশধর। যৌবনের প্রারম্ভে ধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন। বাংলায় তখন যুগ-সন্ধিক্ষণ। ইংরেজী শিক্ষা ও খ্রীস্ট ধর্মের প্রবল প্রচারে হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাসে এসেছে বিপর্যয়। হিন্দু সমাজের বিধিনিষেধের কঠোরতা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ধর্মব্যাখ্যায় গোঁড়ামি, নানা প্রকার কুসংস্কার জর্জরিত হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে দেখা দিল শিথিলতা। দলে দলে লোক খ্রীস্টানধর্ম অবলম্বন করতে লাগল। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করলেন। করলেন বেদে উল্লিখিত একেশ্বরবাদের প্রচলন। একটা নূতন প্রেরণা, নূতন অনুভূতি জাগল শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ভেতর। অনেকেই গ্রহণ করলেন এই নূতন মতবাদ। সৃষ্টি হল ব্রাহ্মসমাজের।

রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনকে সার্থক করে

তোলার জন্য প্রয়োজন হল কয়েকজন মহাপুরুষের অভ্যুত্থান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটল। এই সময় ব্রাহ্মধর্ম তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল। নতুন ধর্মের এই প্রবল প্রবাহে অনেকেই ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের পুরাতন ধর্মবিশ্বাস, দলে দলে গ্রহণ করছিলেন ব্রাহ্মধর্ম। বিজয়কৃষ্ণ তাঁদের অন্যতম।

বিখ্যাত অদ্বৈত প্রভুপাদের বংশধরের ধর্মান্তর গ্রহণ! সেকালের সমাজে এক অভাবনীয় ঘটনা। বংশধারার মতবাদের প্রতি এল সংশয়। ধর্মান্তর গ্রহণ করে বিজয়কৃষ্ণ শুধু একজন সাধারণ ব্রাহ্ম হয়েই রইলেন না। তাঁর ভেতরে ছিল বংশের অর্জিত ধর্মভাবের মালমশলা। তার সহযোগে সমাজের ভেতর লাভ করলেন বিশিষ্টতা, হলেন আচার্য। ব্রাহ্মধর্মের মহিমা প্রচার করে অল্প সময়েই দেশে বিদেশে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন।

অচিন্ত্যনীয় দৈব গতি। ব্রাহ্মধর্মের পরম সেবক, অক্লান্ত কর্মী বিজয়কৃষ্ণের নব বিশ্বাসে পুনরায় সংশয় দেখা দিল। তিনি আবার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন। শুরু করলেন যোগাভ্যাস। সাধু মহাপুরুষদের সঙ্গলাভের জন্য নানাদেশ ভ্রমণ করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর বহু সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভ ঘটে।

নিজের ধর্ম জীবনের গতি বিশ্লেষণ করে বিজয়কৃষ্ণ বলেছেন:

—"পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজে প্রথম আসি।...অনেক বিপদ আপদ উত্তীর্ণ হইয়া বিস্তর সত্যলাভে সমর্থ হইলাম। উপাসনা প্রার্থনা, ধ্যান-ধারণাদি করিতে শিখিলাম; এক কথায় বলিতে গেলে, ব্রাহ্ম-সমাজের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করিয়া উদ্ধার পাইয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণের পিপাসা তাহাতেও মিটিল না; কারণ তখনও আমার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের মধ্যে

বসাইয়া পূজা করিতে পারিতাম না।···জীবনে প্রকৃত ধর্মের অবস্থা অতি হীন। সুবিধা হইলে এবং লোকে জানিতে না পারিলে, সকল প্রকার পাপই আমাদ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ব্রহ্মলাভ ও দিনযামিনী তৎসহ বাস ব্যতীত ইহার আর কোনও উপায় নাই। তখন নানাস্থানে ঐ ঔষধির অন্বেষণে ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ধর্ম বন্ধুর সহবাসে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলাম। তাঁহাদের নিকট বিস্তর ধর্মকথা ও অনেক উপকার পাইলাম, কিন্তু তাহাতেও আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে পারিলাম না।·· অঘোরপন্থীদের নিকট গেলাম: তাঁহারা সাধক বটেন, তাঁহাদের নরমাংসাহার ও অন্যান্য বীভৎস ব্যাপারে আমার রুচি হইল না। কাপালিক-দিগের ব্যবহার আরও ভয়াবহ দেখিলাম। রামাৎ, শাক্ত. বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান ফকির এবং বৌদ্ধ যোগী সকলের নিকটেই গেলাম, কিন্তু কোথাও প্রাণের পিপাসা দূর হইল না। অবশেষে ঈশ্বর কৃপায় গয়াতীর্থে আকাশগঙ্গা নামক পর্বতে একজন নানকপন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে এই যোগ ধর্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনে এক অপূর্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে। অবশ্য আমি দেবতা হইয়া গিয়াছি বলিতে পারি না, কিন্তু এইটুকু না বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় ও অকৃতজ্ঞতা হয় যে আমার অভাব মোচন হইয়াছে, এবং আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসিয়াছি। কি যে সম্মুখে দেখিতেছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।”

অন্যত্র—

“আমার নিজের জীবন চিন্তা করিয়া দেখি আমি ইচ্ছাপূর্বক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু করি নাই। টোলে পড়িতাম, গোঁড়া হিন্দু ছিলাম। হঠাৎ সংস্কৃত কলেজে গেলাম, অজ্ঞাতসারে বৈদান্তিক

হইলাম। পরে ব্রাহ্মসমাজে গেলাম, প্রচার করিলাম, চিকিৎসা করিলাম। আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় নাই।”

প্রশ্ন জাগে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা (Freedom of Will) কিছু আছে কি না? যদি থাকে তাহলে তা সীমাবদ্ধ। এবং ঐ সীমা লঙ্ঘন হয়ে গেছে অনেক কাল আগে, স্বাধীন ইচ্ছাজাত কর্মদ্বারা। এখন যা কিছু ঘটছে তা পূর্ব জন্মের কৃতকর্মের ফলদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অথবা কর্মফল বলে কিছু নেই, একমাত্র ঈশ্বরই সব কিছুর নিয়ন্তা। ভালতেও তিনি মন্দতেও তিনি। জীবকে তিনিই দেন সুখ, দুঃখের দাতাও তিনি। তিনি লীলাময়।

বিজয়কৃষ্ণের জীবনে ধর্মবিশ্বাসের এই যে পরিবর্তন এটা ঘটনাচক্র, তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়। সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে পথে তিনি প্রথম পদক্ষেপ করেন, সে পথে আনন্দ পেয়েছেন কিন্তু সন্তোষ লাভ করতে পারেন নি। তাই চলে অনুসন্ধানের পুনরাবৃত্তি। ‘উদ্যোগিনং পুরুষসিংহং…।’ উদ্যোগী পুরুষেরা চেষ্টার ফল লাভ করলেন। তিনি পেলেন নামব্রহ্মের উৎসের সন্ধান। এই পূজায় ভক্তিই শ্রেষ্ঠ উপকরণ এবং এতে নেই কোন জাতি বা বর্ণের বিচার।

প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম সাধন। অর্থাৎ দুইবার শ্বাস প্রশ্বাসে একবার নাম সাধন করতে হয়। এতে আসবে প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা; থাকবে না কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ষড়রিপু। এ জগতের একজন কর্তা আছেন এই বিশ্বাস যার আছে তারই উপযোগী উপদেশ শুধু নামজপ। কর্তা আছেন শুধু মুখে বললেই হবে না, হতে হবে পূর্ণবিশ্বাসী। শিশুর যেমন মায়ের প্রতি নির্ভর সেই নির্ভরতার প্রয়োজন। তাতে থাকবে না যুক্তি, থাকবে না নেতি নেতি করে বিচার। তবেই পাওয়া যাবে নামীকে।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

বিজয়কৃষ্ণ মানুষের চরম কাম্য সিদ্ধাবস্থা লাভ করলেন ১২৮৯।৯০ সালে তিনি পরমহংস স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করে এক বৎসর নির্জন সাধনা করেন। দীক্ষার পর ১৪।১৫ দিন একরূপ বাহ্যজ্ঞান রহিত অবস্থায় থাকেন। পরে গুরুর আদেশে বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে নির্জনে সাধনা করেন, তাঁরই আদেশে কাশীতে এসে পরমহংস হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস নেন। এ সময় তিনি সন্ন্যাস উপযোগী গৈরিক কৌপীন ও বহির্বাস পরিধান করেন এবং এই বেশে বাংলা দেশে চলে আসেন। ১২৯৫ সালে জন্মাষ্টমীর দিন ঢাকার পূর্বদিকে গেণ্ডারিয়ায় স্বতন্ত্র আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রাহ্মসমাজ-প্রচারক থাকাকালে তাঁর যশ সম্প্রদায়বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু গেণ্ডারিয়ার আশ্রম স্থাপনার পর তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, অনেক ভক্তের সমাগম হতে লাগল। আশ্রমে সর্বদা নাম কীর্তন হত।

হরের্ণামৈব হরের্ণামৈব হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্তেব কলৌ নাস্তেব কলৌ নাস্তেব গতিরন্যথা॥

সকালবেলা।

আশ্রমের বারান্দায় বসে লোকনাথ ও ভক্ত কামিনীকুমার নাগ। অদূরে বেলগাছ তলায় শুয়ে পরম নিশ্চিন্তে জাবর কাটছে কালাচাঁদ। কে জানে তার গো-জীবনের কোন্ সার্থকতার কথা ভেবে তার মনের এই প্রশান্তি। আদরী তার বিড়ালসুলভ চপলতায় কালাচাঁদের সামনে গিয়ে খেলাচ্ছলে আক্রমণ করার

নানা অঙ্গভঙ্গি করছে, কিন্তু ষণ্ড প্রবর কালাচাঁদের তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। আদরীর ভয় প্রদর্শনে তার বিশাল দেহে কোন প্রকার চাঞ্চল্যের প্রকাশ নেই; শুধু মাছি তাড়াবার প্রয়োজনে মাঝে মাঝে লেজ ও কান দুটি নাড়ছে। কুকুরেরা রাতে জাগরণে ক্লান্তিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে এদিকে সেদিকে পড়ে ঘুমচ্ছিল, তাদের দু'একজন আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে শয্যাত্যাগ করার উপক্রম করছে। আদরীর এই যুদ্ধোদ্যম ভঙ্গিমা তাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। ছুটাছুটির ফাঁকে তাদের দু'একজনের সামনেও ফ্যাস্ করে উঠেছে; কিন্তু নিতান্তই ছেলেমানুষী ব্যাপার মনে করে ওরা ঘটনাটাকে বড় একটা আমল দেয়নি। সকলেই আশ্রমবাসী, আশ্রমের অন্নেই প্রতিপালিত। পরস্পরের ভেতর জাতিগত বৈষম্য থাকলেও মনের দিক দিয়ে গড়ে উঠেছিল সখ্যতা। আশ্রমের শান্ত পরিবেশে এদের স্বভাবে এসেছে পরিবর্তন।

লোকনাথ বললেন:

—কামিনী, বিজয় আসছে।

কামিনীবাবু বিস্মিত হলেন। বিজয়কৃষ্ণ বারদীতে এলে অন্ততঃ কামিনীবাবুকে তিনি একটা খবর দিতেন। তাই অবিশ্বাসের সুরে বললেন:

—হ্যাঁ, আমরা কিছু জানলুম না, আপনি জানলেন।

কিন্তু কথাটা বলেই কামিনীবাবু লজ্জিত হয়ে পড়লেন, বুঝলেন মহাপুরুষের বাক্যে অপ্রত্যয় অন্যায়। তাই কথাটা সংশোধনের জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন:

কোন্ পথে আসছেন? মেঘনা, না ব্রহ্মপুত্র দিয়ে?

ব্রহ্মপুত্র দিয়ে আসছে।

তাহলে চামার বাড়ির কাছে এসে নৌকো ঠেকবে। সেখানে জল কম।

উদ্বিগ্ন হয়ে কামিনী উঠে পড়লেন। গ্রাম থেকে কয়েকজন প্রজা ও ভ্রাতুষ্পুত্র হরিশ্চন্দ্র রায়কে নিয়ে রওনা হলেন বিজয়কৃষ্ণকে এগিয়ে নিয়ে আসতে। চামার বাড়ির কাছে পৌঁছতেই দেখলেন লোকনাথ বাবার কথাই ঠিক। কথামতো গোস্বামী মহাশয়ের নৌকো চড়ায় ঠেকে গেছে। সকলে জলে নেমে নৌকো ঠেলে চড়া থেকে নামিয়ে দিলেন। নৌকো এসে ভিড়ল আশ্রমের ঘাটে।

গোস্বামী মশাই নৌকো থেকে নামলেন। সঙ্গে এসেছেন শ্যামাচরণ বক্সী ও বিধুভূষণ ঘোষ। কামিনীবাবু পথ দেখিয়ে এঁদের নিয়ে এলেন আশ্রম বাড়িতে। ঘরের বারান্দায় উঠতে উঠতে বিজয়কৃষ্ণের ভাবান্তর উপস্থিত হল। চোখের দৃষ্টি হয়ে এল স্থির, শ্বাস প্রশ্বাস বইছে ধীরে। চোখের সামনে ভেসে উঠল অপূর্ব এক ছবি। তিনি দেখছেন লোকনাথকে। কিন্তু কোথায় লোকনাথ? এ যে সব দেবদেবী, ঘরের সমস্ত জায়গায়, গায়ের কাপড়খানা পর্যন্ত দেবদেবী ভরা। নিশ্চল প্রস্তর মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ। মহাপুরুষের অচিন্ত্যনীয় মহিমায় আত্ম-হারা বিজয়ের চোখ দিয়ে নেমে এল স্বর্গীয় আনন্দের পূতধারা। কিন্তু একি! লোকনাথের স্থির দৃষ্টির পথ দিয়ে বেরিয়ে আসছে কী অপূর্ব এক তেজ আর বিজয়কৃষ্ণের দেহে তা প্রবেশ করছে। একি অনুভূতি! বিজয়ের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। পায়ের তলা থেকে সরে গেল পৃথিবীর অবলম্বন। মুগ্ধের মত, নিরাশ্রয়ের মত বিজয়কৃষ্ণ লুটিয়ে পড়লেন ব্রহ্মচারীর পদতলে। পুত্রবৎসল পিতার মত লোকনাথ দু'হাত দিয়ে বিজয়ের বরবপু তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাকে শান্ত সুস্থ করলেন। অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বিজয় প্রশ্ন করলেন:

—এতদিন আমাকে দয়া করনি কেন?

লোকনাথের কণ্ঠেও শোনা গেল ক্ষোভের সুর। বললেন, তুইও ত পাষাণ!

আশ্রমের সেবক কানাই কবিরাজকে ডেকে বললেন লোকনাথ:

—কানাই, ঐ যে ছেলেটি বেল নিয়ে আসছে ঐটি নিয়ে আয় আমি খাব।

সঙ্গে সঙ্গে কানাই আদেশ প্রতিপালন করলেন। লোকনাথ বেলটি ভেঙে সামান্য একটু জিহ্বায় স্পর্শ করে কিছুটা স্বহস্তে গোস্বামী মশাইকে খাইয়ে দিলেন। ভুক্তাবশিষ্ট দিয়ে দিলেন উপস্থিত ভক্তবৃন্দের ভেতর বিতরণ করে।

গোয়ালিনী মা এসেছেন স্নান করে। বিজয়কে দেখে লোকনাথকে জিজ্ঞেস করলেন:

—এটি কে বাবা?

—ঘরের ছেলে। লোকনাথ বললেন।

গোয়ালিনী মার অন্তর পুত্রবাৎসল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। অমৃতের ধারায় ভরে উঠল বুক। মায়ের মত আসন করে বসে ছোট শিশুটির মত বিজয়কে কোলে তুলে বসালেন, মুখে তুলে দিলেন স্তন। বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভক্তগণ অদূরে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলেন স্বর্গীয় এই দৃশ্য! অভিনব জগতের অপূর্ব এই জীবদের লীলা অলোকসামান্য। তাদের ভাব সাধারণ সংসারী জীবের বুদ্ধির অগোচর আর অনুভূতির অতীত!

বারদীর অধিবাসীরা বিজয়কৃষ্ণকে দেখবার জন্য উৎসুক। লোকনাথ জানতেন এ কথা। তাই আহারাদির পর বিজয়কে বললেন:

—শ্রীনন্দের নন্দন একা আমার নয়, তোকে দেখবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব, তুই যা।

আদেশ মত গোস্বামী মহাশয় কামিনীবাবুর সঙ্গে চললেন

তাঁর গৃহাভিমুখে। পথে চলতে কামিনীবাবু গোস্বামী মশাইকে প্রশ্ন করলেন :

—ব্রহ্মচারীর মধ্যে আপনি কী দেখতে পেয়েছেন ?

বিজয় বললেন :

—আমার কথা কি তুমি বিশ্বাস করবে ?

উত্তর শুনে আহত হয়ে কামিনীবাবু বললেন :

—সে কি কথা! ছোটকাল থেকে আপনার কত সৎ উপদেশ পেয়েছি, আপনার কথা বিশ্বাস করব না ?

বিজয় বললেন,

—আমি বহু সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমে গেছি, কোনখানে কিছু দেখিনি, কোনখানে এক আনা, কোনখানে দু'আনা। কেবল একখানে দেখেছি চার আনা। আবার কোন আশ্রমে এমনও হয়েছে যে, যতক্ষণ সেখানে রয়েছি ততক্ষণ আশ্রমস্থ সাধুর প্রভাব বুঝেছি, আশ্রমের বাইরে এসে তার কোন প্রভাবই আর মনের ভেতর থাকেনি। কিন্তু এখানে যা শুনে এসেছিলাম তার চাইতে দেখলাম অনেক বেশি।

ব্রহ্মচারী বাবা নিবৃত্ত্যাত্মক লোক, ইচ্ছা হলে এখনই চলে যেতে পারেন। আমাকে এক সেকেণ্ডে যে অনুগ্রহ করেছেন তাতেই আমি ধর্মজীবনে উন্নতি লাভ করতে পারব। আমাকে বুকে ধরে তিনি বলেছিলেন,—তুই এসেছিস ভালই হয়েছে। আমার ভার তুই নে, আমি চলে যাই। কিন্তু পরমুহূর্তে আমার শরীরের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন,—হবে নারে, তোর শরীরটা নেহাৎ অপটু,—আমার ভার তুই বহন করতে পারবি না। তোকে গড়ে নিতে হবে। বুঝলে কামিনী, অসামান্য শক্তিশালী এই পুরুষ, লোকনাথের প্রতি লোমকূপে দেবতা। আমি আজই বুঝতে পেরেছি চন্দ্রনাথ পাহাড়ে দাবানলের হাত থেকে ইনি আমাকে রক্ষা করেছিলেন।

লোকনাথকে দর্শন করে গোস্বামী মশাই ফিরে এলেন ঢাকায় তাঁর আশ্রমে। ভক্তদের কাছে লোকনাথ সম্পর্কে তাঁর অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা বললেন। এত বড় শক্তিধর মহাপুরুষ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করছেন। তাঁরই আশ্রমের এত নিকটে এ আবিষ্কার তাঁকে শুধু বিস্মিত করেনি, মনের মধ্যে জেগে উঠেছে একটা কর্তব্যবোধ—যবনিকার অন্তরাল থেকে তাঁকে বাইরে নিয়ে আসা, লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরা তাঁর মহিমময় মূর্তি।

হলও তাই। বিজয়কৃষ্ণের প্রচারের ফলে অল্পদিনের মধ্যে লোকনাথের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দেশ বিদেশ থেকে বহুলোক সমাগত হতে থাকল লোকনাথের আশ্রম আঙিনায়। শিক্ষিত অশিক্ষিত বিশ্বাসী অবিশ্বাসী তত্ত্বজিজ্ঞাসু নানা রকম প্রার্থী। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান সকলেরই হল ঠাঁই।

ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর। ক্ষ্যাপা মানুষ রজনীকান্ত চক্রবর্তী। সরকারী চাকুরে, সেরেস্তাদার। মহাপুরুষ দর্শন ও সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে মনে। মনের লোহাকে সাধুর স্পর্শে করে তুলবেন সোনা এই তাঁর ইচ্ছা। বৈরাগ্য এসেছে অন্তরে। ইহলৌকিক ভোগ-সুখে জেগেছে বিতৃষ্ণা। এই বৈরাগ্য হঠাৎ এক দিনের নয়, তিলে তিলে সঞ্চিত হচ্ছিল মনের ভেতর বহুদিন ধরে। যেটুকু দ্বিধা ছিল তাও সরে গেছে সতী শিরোমণি সহধর্মিণীর সহযোগিতায়। আদর্শ সহধর্মিণী, স্বামীর ধর্ম আচরণে সহায়তার জন্য অদ্ভুত আত্মত্যাগ—মহাশক্তির অংশসম্ভূতা নারী। কতই বা বয়স! মোটে ছাব্বিশটি বছর অতিক্রম করেছেন। প্রবাসী স্বামী কর্মস্থল থেকে ছুটিতে এসেছেন ঘরে। কি এক ব্রতোপলক্ষে সতী উপবাসী। ব্রত উদযাপন করে রাত্তের অবসরে মিলিত

হলেন স্বামীর সঙ্গে নির্জনে। স্বামী রজনী বিস্মিত হলেন স্ত্রীর অভাবনীয় এক রূপ দেখে। স্ত্রীকে এত সুন্দর তিনি কখনও দেখেন নি। আনন্দ যেন মুখে চোখে ধরে না। রূপ সর্বাঙ্গ উছ্‌লে পড়ছে। অলৌকিক এক জ্যোতি যেন দেহ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। প্রবাসী স্বামীর বিরহ-তপ্ত মন প্রিয়তমার যে সৌন্দর্যে অবগাহন করে শীতল হতে চেয়েছিল, এ ত সেই সৌন্দর্য নয়!—গৃহিণী, সচিব, সখিরূপে যাকে চেয়েছিলেন সে কোথায়! কোথায়ই বা সে সম্ভাষণ যে সম্ভাষণে দেহের প্রতি রোমকূপে জেগে উঠে শিহরণ, বুকের রক্ত হয়ে ওঠে উচ্ছল। চোখের দৃষ্টিতে ঝরে মোহিনী মায়া, প্রকাশ পায় অব্যক্ত কোন ভাষা। কিন্তু এ সৌন্দর্য চোখ তুলে দেখা যায় না, দৃষ্টি নেমে আসে পদতলে। পরিবেশে স্নেহের শীতলতা ভরা মাতৃভাবের কল্যাণময় অনুভূতি।

দেবীমূর্তির অধরোষ্ঠ নড়ে উঠল। মুখে ফুটে উঠল ত্যাগের বাণী—

আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার দেহের সব সম্পর্ক ছিন্ন হল। স্বামী-স্ত্রীর কোন সম্পর্ক আর দুজনের মধ্যে থাকবে না। শুধু তোমার ধর্ম আচরণে থাকবে আমার সকল রকম সহায়তা। আজ তোমাকে এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

বিস্মিত পুলকিত রজনীর অন্তর এক অপূর্ব ভাবে ভরে উঠল। যা সে এতদিন মনে মনে চেয়েছিল, কিন্তু দ্বিধা ছিল স্ত্রীর কথা চিন্তা করে সেই কথা তারই মুখ দিয়ে এসেছে! প্রাণের দেবতা শুনেছেন তাঁর প্রার্থনা। তাই এভাবে উত্তীর্ণ করে দিলেন দুস্তর এই পারাবার। আবেগ-উচ্ছ্বাসে স্ত্রীর হাত দুটি ধরে বললেন:

—কল্যাণি, তাই হক। আমি প্রতিজ্ঞা করলুম আজ থেকে তুমি আমার স্ত্রী নও—মা।

অলৌকিক কী এক ভাবে ভরে উঠল উভয়ের মন। মুখেচোখে স্বর্গীয় এক জ্যোতি, তাঁরা যেন এ-জগতের কেউ নয়।

স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। যথাসময়ে তিনি একটি কন্যারত্ন প্রসব করেন। তারপর আর বেশিদিন বেঁচে থাকেন নি। স্বামীকে রেখে এগিয়ে গেলেন স্বামীর ভবিষ্যৎ চলার পথকে স্বচ্ছন্দ করার জন্য।

উন্মনা রজনী পথের সন্ধানে খুঁজে বেড়ান সিদ্ধ মহাপুরুষ। একদিন গিয়ে উপস্থিত হলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রমে। গোস্বামী মশাই তাঁকে বললেন বারদীর ব্রহ্মচারীর কথা।

—অনেক তীর্থ ঘুরেছি—কিন্তু বারদীর আশ্রমে যে রকম উচ্চ কোটির মহাপুরুষ দেখেছি এ রকমটি আর কোথাও দেখিনি। লোকনাথের সর্বাঙ্গ দেবদেবীময়। এই শ্রেণীর মহাপুরুষেরা নিম্ন ভূমিতে কদাচিৎ আসেন।

শুনে রজনীর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল লোকনাথকে দেখার জন্য। আগ্রহের তীব্রতায় তাঁর আর অফিসে ছুটি নেবার ধৈর্য রইল না। তিনি বৃন্দাবনচন্দ্র দেকে নিয়ে একদিন রওনা হলেন বারদী অভিমুখে। তাঁরা নৌকো পথে ঢাকা হয়ে বারদী এলেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নৌকো এসে বারদী বাজারের পশ্চিম দিকের আখড়ার কাছে পৌঁছলে অন্য এক নৌকো থেকে প্রশ্ন শোনা গেল।

—নৌকো কোথা থেকে এসেছে?

বৃন্দাবন দে উত্তর করলেন:

—ঢাকা থেকে।

—রজনীবাবু এলেন নাকি?

প্রশ্ন শুনে বৃন্দাবন প্রতি-প্রশ্ন করলেন:

—আপনি কি করে জানলেন?

অন্য নৌকোর আরোহী উত্তর করলেন:

—ঢাকা থেকে বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তী এসে বলে গেছেন।

বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তী ঢাকা মুন্সেফ কোর্টের একজন উকিল।

অসম্ভব! বৃন্দাবন ও রজনীবাবু উভয়ে বিস্মিত হলেন। বিষ্ণুবাবুর তাঁদের সঙ্গে বারদী আসার কথা হয়েছিল সত্যি কিন্তু নৌকো ছাড়ার মুহূর্তে খবর পাঠিয়েছিলেন যে বিশেষ কোন কারণে তাঁর যাওয়া হচ্ছে না। অথচ সেই লোক রাতের মধ্যে বারদী পৌঁছে আশ্রমে খবর দিয়ে ফিরে গেছেন? কোন মানুষের পক্ষে এতখানি ক্ষিপ্রতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে কি গোস্বামী মশাই-এরা যা শুনেছেন তা সত্যি? সত্যিই কি এই মহাপুরুষ ভূতভবিষ্যৎদ্রষ্টা! আনন্দে হৃদয় ভরে উঠল। নৌকো থেকে অবতরণ করে দুজনে প্রাতঃস্নান সেরে রওনা হলেন আশ্রম অভিমুখে। শূন্য হাতে দেবতার স্থানে কেউ যায় না, তাই এক সের মিছরি নিলেন মহাপুরুষের ভোগের জন্য।

আশ্রমে পৌঁছে রজনীবাবুর হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল। কি অপূর্ব স্থান! এ যেন সেকালের মুনিঋষিদের আশ্রম। ফল ফুল বৃক্ষাদি সযত্নবর্ধিত। আঙিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সমস্ত স্থান জুড়ে একটা পবিত্র ভাব বিরাজমান। আপনা থেকেই মনে জেগে ওঠে একটা প্রশান্তি। পরিবেশ এমনি মধুর, এমনি শান্ত! একটা বেলগাছ—মাটি থেকে প্রায় চার হাত পরিমাণ সোজা উঠে তিনটি শাখায় ভাগ হয়ে গেছে এবং এর শাখা প্রশাখা চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, মনে হয় যেন একটি বটবৃক্ষ। গাছের গোড়া মাটি দিয়ে গোল করে বাঁধান। লেপে পুঁছে তকতক ঝকঝক করা।

রজনীবাবু ব্রহ্মচারীর ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন। দেখলেন জনৈকা মহিলা ছোট ছোট টগর ফুল দিয়ে লোকনাথের চরণ-পূজা সবেমাত্র শেষ করলেন।

রজনী মিছরির পুঁটুলি ব্রহ্মচারীর সম্মুখে রেখে তাঁর চরণদ্বয় নত মস্তকে স্পর্শ করলেন। প্রণাম সেরে উঠে লোকনাথের দক্ষিণদিকে মাটির উপরেই বসে পড়লেন। লোকনাথ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন :

—এখানে কেন ? ঐখানে ঐ আসন নিয়ে বস।

এই বলে বারান্দায় অবস্থিত কুশাসন দেখিয়ে দিলেন।

রজনীবাবু অনুরোধের সুরে বললেন,

—এখানে আপনার চরণের ধারে বসার বাসনা।

—বাসনা ! বাসনাতেই ত সব মাটি করলে !

সহসা লোকনাথের পলকশূন্য চোখ দুটি স্থির হয়ে গেল, শ্বাস প্রশ্বাসেরও কোন সাড়া শব্দ নেই। যেন চিত্র পুত্তলিকা ! এই মর্ত্যধাম ছেড়ে অজানা কোন্ দেশে চলে গেছে কে জানে। অপার্থিব কোন পুষ্প-সৌরভে সমস্ত স্থান সুরভিত। প্রায় মিনিট পনের পরে লোকনাথের দেহে প্রকাশ পেল বাহ্যিক চেতনা। ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে এলেন এই জগতে।

—নাম কি ?

রজনীকান্ত চক্রবর্তী। শুরু হল উভয়ের মধ্যে প্রশ্নোত্তর। পরিচয় জানলেন ফরিদপুর জেলার পালং থানার অধীন মহিসার গ্রামনিবাসী কালীচরণ চক্রবর্তীর পুত্র। ঢাকার প্রথম সবজজ আদালতের সেরেস্তাদার। শুনলেন পারিবারিক অনেক কাহিনী, মানসিক ভাবেরও পেলেন পরিচয়। তাই আনন্দের সুরে বললেন,

—সত্যযুগ ফিরে এল নাকি রে ? তুই আমার কাছে এসেছিস কেন, আমার উচিত ছিল তোর কাছে যাওয়া।

তাইত ! কে এসেছেন কার কাছে ? সাধনতীর্থ হিমালয়ের শিখরদেশ থেকে সাধু নেমে এসেছেন রোগতাপময় মানুষের সমাজে—কোন্ প্রয়োজনে ? ফিরে এসেছে সত্যযুগ।

মানুষের প্রয়োজনে যুগ এসেছে ফিরে, না যুগের প্রয়োজনে মানুষ ?

রজনীবাবু উঠে এলেন। লোকনাথের কথায় মনের ভেতর উঠেছে ভাবের তরঙ্গ। একটি আমগাছের তলায় এসে বসলেন। সহসা বৃষ্টি এল। রজনী উঠলেন না। মনের ভাব, জ্ঞাত অজ্ঞাত মনের যত কিছু পাপ সব কিছু ধুয়ে যাক বৃষ্টির জলে। আর জলে ভেজার দরুন অনিষ্টের আশঙ্কা যদি কিছু থাকে, তাহলে সে চিন্তা করবেন তিনি যাঁর পাদপদ্মে করেছেন আত্মসমর্পণ।

লোকনাথ ডেকে পাঠালেন। বললেন,

—ছায়ার কচু, রোদবৃষ্টি এখনও সহ্য হবে না।

অন্তর্যামী লোকনাথ। রজনী ধূমপানে অত্যন্ত আসক্ত; ধূমপানের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে অনেক বার।

—তুই কেমন ভক্তরে আমাকে তামাক খাওয়াতে পারলি না ?

ব্যস্ত হয়ে রজনী তামাক সেজে এনে লোকনাথকে দিলে। তুই এক টান দিয়ে রজনীর হাতে হুঁকো দিয়ে বললেন,

—খা।

লজ্জিত রজনী ব্রহ্মচারীর হাত থেকে হুঁকো নিয়ে ওঠার উপক্রম করলেন।

—না, তোকে এখানে বসে খেতে হবে।

নিরুপায়ের মত মানতে হল লোকনাথের আদেশ। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তামাকের আসক্তি তার কেটে গেল একেবারে সারা জীবনের মত। লোকনাথ বলে দিলেন,

—জন্মাষ্টমীর ছুটিতে আসিস।

লোকনাথের আশীর্বাদ নিয়ে রজনী ফিরে এলেন ঢাকা। কিন্তু সে রজনী আর নেই! বন্ধুবান্ধব সহকর্মী সকলেই লক্ষ্য করলেন রজনীবাবুর এই ভাবান্তর। কলের পুতুলের মত সব

কাজই করে যাচ্ছেন কিন্তু প্রাণটি যেন পড়ে আছে কোথায়! অন্তরে কিসের একটা দারুণ অভাববোধ—কি যেন ছিল, সেই কি যেন আর নেই। দিনের পর দিন মনের এমনি ভাব নিয়ে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। ব্যাকুলতা বেড়েই যাচ্ছে কিন্তু নির্দিষ্ট দিনটি যেন এসেও আসছে না। নির্দিষ্ট দিন মানে জন্মাষ্টমীর ছুটি। লোকনাথ যেতে বলেছেন। শুধু ঐ দিনটির জন্য মন পড়ে আছে। লোকনাথকে আবার একবার দেখার উদগ্র কামনা হৃদয়ের মধ্যে জেগে রয়েছে।

রজনীর পরশ পাথর খুঁজে বেড়ানো সার্থক হয়েছে এতদিনে; তিনি পেয়েছেন পরশ পাথর। তাঁর মনের গায়ে রং লেগেছে। জেগেছে ফাগুন প্রাতের উতলা বাতাস। পেয়েছেন কাণ্ডারী, ভবরোগের বৈদ্য।

তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। নারায়ণগঞ্জ মুন্সেফী আদালতে ওকালতি করেন। পণ্ডিত লোক, দর্শনশাস্ত্রে অনুরাগী। পৃথিবীর সব কিছুকে যুক্তি দিয়ে বুঝে নেবার প্রবণতা। তথাপি একেবারে শুষ্ক দার্শনিকত্ব নয়, ভক্তির জারকরসে তা মাঝে মাঝে জারিত হয়ে ওঠে।

ব্যবসাঘটিত ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে মাঝে অন্তরে বোধ করেন একটা অভাব। কিন্তু কি যে সে অভাব তা সঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। সব কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং দিনের পর দিন তা বেড়েই চলে। যুক্তিতর্ক দিয়ে মনকে আর বুঝ মানানো যায় না।

তিনি শুনেছেন লোকনাথের কথা সহকর্মী অনেক উকিল বন্ধুদের মুখে। লোকনাথের অলৌকিক শক্তি, অসামান্য যোগবল মানুষের মুখে মুখে প্রচার হতে হতে তাঁর কানেও পৌঁছেছে।

তাঁর যুক্তিবাদী মন সব কিছুকে সত্য বলে যে মেনে নিয়েছেন তা নয়, তবু তাঁর চির-জিজ্ঞাসু মনে জেগেছে প্রশ্ন। সত্যি একি সম্ভব! যোগ সাধনার দ্বারা সত্যি কি এত শক্তিশালী হওয়া যায়! পাওয়া যায় কি পরম কাম্য চিরন্তন সেই সত্যকে? দূর হয় কি হৃদয়ের এই অভাববোধের তাড়না? কে বলে দেবে তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর, সমাধান করে দেবে মনের সমস্ত সংশয়ের?

ব্যবসায়ে আর মন নেই। তুচ্ছ ইহলৌকিক কামকাঞ্চনে এসেছে বিতৃষ্ণা। মন ছুটে চলেছে কোথায় কোন্ অজানার সন্ধানে। শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের এই ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি একদিন এসে উপস্থিত হলেন বারদীর লোকনাথের আশ্রমে। বহুলোক সমাগম। কত রোগী—অন্ধ, আতুর, বাত ব্যাধিগ্রস্ত, বন্ধ্যানারী —নানা রকমের মানুষ। কেউ নৌকো ভাড়া করে নদীতে, কেউ বজরায়, কেউ আশ্রমের ঘরে। যার কোথাও স্থান হয়নি সে আছে আশ্রম আঙিনায় পড়ে। সকলেরই প্রার্থনা শুধু দাও— স্বাস্থ্য দাও, যশ দাও, অর্থ দাও, স্বামী দাও, পুত্র দাও, দাও জগতের সমস্ত ভোগের অবাধ ছাড়পত্র।

তাইত! সকলেই চাইতে এসেছে, কিন্তু দিতে ত আসেনি কেউ! কিন্তু কিইবা দেবে এরা? সংসারে বঞ্চিত এরা, শোষিত এরা; এদের আছেই বা কি যে দেবে? শুধু অভাব, চারদিকে অভাব, তাইত এদের এত চাওয়ার তাগিদ।

প্রার্থীর দলে তিনিও। শুধু প্রার্থিত বস্তুর প্রকারভেদ। ভিড় এড়িয়ে তিনি উপস্থিত হলেন আশ্রম কুটীরের বারান্দায়। বহু ভক্ত বেষ্টনীর ভেতর বসে আছেন সিদ্ধ মহাপুরুষ—বহুখ্যাত লোকনাথ ব্রহ্মচারী। তারাকান্তের দেহ রোমাঞ্চিত হল দেখামাত্র। যেন বহুদিন অদেখা প্রিয়জন মিলনের অনুভূতি। ক্ষণিকের জন্য

এল বিস্মৃতি। কিন্তু বলিষ্ঠ যুক্তিবাদী মন ঝেড়ে ফেলে দিল সমস্ত ভাবাবেগ। এ অসম্ভব সম্ভাবনা, কল্পনার স্বপ্নবিলাস!

লোকনাথ তাঁর পলকহীন দৃষ্টি তুলে নবাগতকে একবার দেখে নিতেই তাঁর মনে জেগে উঠল স্মৃত-বিস্মৃত কত কথা, কত পাহাড় পর্বত, দেশ ভ্রমণ, বাল্যসুহৃদ বেণীমাধব, হিতলাল, পিতৃতুল্য গুরুদেব, গুরুদেবের অপরিসীম স্নেহ, তাঁর দেহত্যাগ, প্রতিশ্রুতি। মুহূর্তে জেগে উঠে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল অতীতের একটা স্বপ্ন।

সহসা প্রশ্ন করলেন :

—কি জন্য এসেছ ?

—তোমার নাম শুনেছি, তাই দেখতে এসেছি।

উপস্থিত ভক্তেরা চমকে উঠলেন নবাগতের মুখে 'তুমি' সম্ভাষণ শুনে। কিন্তু বক্তা বা শ্রোতার কারো মধ্যে কোন ভাবের ব্যতিক্রম প্রকাশ পেল না। যিনি বলেছেন, তাঁর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় 'তুমি' বলার দাবীটা যেন প্রকাশ পাচ্ছে। শ্রোতার নেই কোন ভাব বৈলক্ষণ্য।

তারাকান্ত বলছেন :

—রামপ্রসাদ গেয়েছেন 'স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।' আমি নিজের ইচ্ছায় সংসারে এসে ঠেকেছি, পড়েছি আপনার ফাঁদে। আত্মমায়ায় আত্মহারা হয়েছি, সেই মায়া অতিক্রম করে যেতে পারছি না। তুমি সাধু তোমার কাছে ফাঁদ এড়াবার কলকাঠি। কি করে মায়াকে বশ করব, তার উপায় তুমি আমাকে বলে দাও। দাও মুক্তিপথের সন্ধান।

লোকনাথ শুনলেন সমস্ত কথা। বললেন :

—উপাসনা করে মায়াকে বশ কর না কেন ?

—প্রকৃতি জড়স্বভাবা, তাঁর উপাসনা করতে ইচ্ছা হয় না।

মৃদু হেসে লোকনাথ বললেন :

—গুটিপোকা নিজের দেহ থেকে রেশম বের করে নিজেকে তা দিয়ে ঢেকে রাখে। তখন তার সামর্থ্য থাকে না ঐ বাসা কেটে বের হওয়ার। অন্য কেউ তাকে বের করে বাঁচাতে পারে না। কিন্তু কালে যখন পূর্বরূপ পরিবর্তন করে গুটিপোকা প্রজাপতিতে পরিণত হয়, তখন সে আপনি আপনার বাসা কেটে বার হয়, তখন আর দরকার হয় না অন্যের সাহায্য নেবার।

তারাকান্ত বুঝলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। জাল কেটে বের হতে হলে প্রজাপতি হতে হবে। মহাপুরুষের বাক্যের এটাই ইঙ্গিত। নিজের উদ্ধারের পথ নিজেকেই করে নিতে হবে, পথের বাধাবিঘ্ন সরিয়ে নিতে নিজেকেই হতে হবে উদ্যোগী। হাত ধরে কেউ তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে না। দর্শনের পণ্ডিত তিনি। যুক্তিতর্ক দিয়ে গড়ে তুলেছেন একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ, অবচেতন মনের প্রেরণা মাঝে মাঝে এই বোধের ফাঁক দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় কিন্তু স্থান করে নিতে পারে না। মহাপুরুষের শক্তির উপর আসতে চায় অবিশ্বাস, তাই থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে করে চললেন আশ্রম ত্যাগ করে।

কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না। অন্তর্যামী ভগবান। লোকনাথ বুঝেছেন তারাকান্তের হৃদয়ের ব্যাকুলতা, জানতে পেরেছেন তার পাণ্ডিত্য আর ভক্তি-বিশ্বাসের সংঘাত। মনে জেগেছে অতীত কোন স্মৃতি। লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে এলেন। বললেন পরম স্নেহে :

—কয়েক দিন এখানে থাক। পরে বিস্তারিত আলাপ হবে।

তারাকান্ত রইলেন। বিস্তারিত বহু আলোচনা হল। লোকনাথের অনুগ্রহে মনের সঙ্গে তারাকান্তের বাইরেরও হল পরিবর্তন। গুরুর কৃপায় গুটিপোকা প্রজাপতি হয়ে পড়ল। রেশমের জাল গেল ছিঁড়ে, বিষয় সম্পদ রইল পড়ে, তারাকান্ত

হলেন শিষ্য, হলেন সন্ন্যাসী—লোকে তাঁকে জানল নতুন নামে, ব্রহ্মানন্দ ভারতী।

স্পর্শমণির ছোঁয়া লেগে সব লোহা হতে লাগল সোনা। লোকনাথের আশ্রমে এল এক ব্রহ্মচারী। নাম অভয়াচরণ চক্রবর্তী। রেজেস্ট্রী অফিসে চাকরী করতেন। স্ত্রী, পুত্র, বড় ভাই নিয়ে সংসার। হঠাৎ সংসার ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। প্রায় সতের বছর পাহাড়-পর্বতে ঘুরে ফিরে এলেন দেশে—ময়মনসিংহে।

শিবচতুর্দশীর আর বেশিদিন বাকি নেই। একদিন অভয়াচরণ ময়মনসিংহ জজকোর্টের এক উকিলের নিকট দুঃখ করে বলছিলেন যে, প্রতিবৎসর তিনি শিবরাত্রির সময় চন্দ্রনাথ দর্শনে যান কিন্তু এবার সময় ও অর্থের অভাবে তা হয়ে উঠল না। কথা শুনে উকিল তার মনের ভাব বুঝলেন। তাই তাকে একটি টাকা দিয়ে বললেন, প্রতি বছরইত পাষাণ শিব পুজো করেন, এবার জীবন্ত শিব দর্শন করে আসুন।

—জীবন্ত শিব! সে কি!

—হ্যাঁ, বারদী গ্রামে এক মহাপুরুষ আছেন। তার মহিমা বহুলোকের মুখে শুনেছি। শিবতুল্য মহাপুরুষ। এবার তাঁকেই দেখে আসুন।

অভয়াচরণ চললেন বারদী। সঙ্গে ছিলেন ব্রাহ্মণদির কৃষ্ণচন্দ্র রায়। শিবরাত্রির আগের দিন তাঁরা পেঁছিলেন ঢাকা। সেখান থেকে হেঁটে রওনা হলেন বারদী। অভয়াচরণের গাঁজা খাওয়ার অভ্যেস ছিল। পথ চলতে তার অনেকবার গাঁজা খাবার প্রবল ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু যে মহাপুরুষকে দেখতে চলেছেন তাঁকে দেখার পূর্বে কোন কিছু সেবন করা উচিত নয় মনে করে গাঁজা কেন কোন কিছুই খান নি।

বারদী পৌঁছে লোকনাথকে প্রণাম করে যেমনি বসতে যাবেন অমনি লোকনাথ অভয়াচরণকে বললেন :

—তুইত গাঁজা খেয়ে থাকিস, একটু সেজে নিয়ে আয় দেখি।

মহাপুরুষের দর্শন হয়ে গেছে এখন আর খেতে আপত্তি কি? কিন্তু সে যে গাঁজা খায় একথা ইনি কি করে জানলেন? আনন্দ আর ধরে না। অভয়াচরণের মনে হল—পেয়েছি, এতদিনে পেয়েছি গুরুর সন্ধান।

পরদিন। লোকনাথ ও অভয়াচরণ কথা বলছেন।

—আমার নিকটে কেন এসেছিস? তুইও মানুষ আমিও মানুষ, মানুষের সহজাত অভ্যাসে দুজনেই এক। তোতে আমাতে তফাৎ কি?

অভয়াচরণের অভিমান হল। বটে! এতদূর থেকে হেঁটে, না খেয়ে তোমার কাছে এসেছি আর তুমি বলছ, 'তুইও মানুষ আমিও মানুষ।' ধরা দিতে চাও না? বেশ তাই হক। লোকনাথের পায়ের উপর তিন বার মাথা ঠুকে রওনা হল। অভয়াচরণ রেগে গেছে।

চিকন্দীর উকিল গিরিশবাবু সেখানে উপস্থিত। তিনি জানতেন অভয়াচরণ উপবাস করে আছেন। তাই বললেন, গতকাল উপোস করেছেন, প্রসাদ না পেয়ে যাচ্ছেন কেন?

অভয়াচরণ না শোনে এমনি করে লোকনাথ বললেন :

—ওর খাবার মিলবে।

গিরিশবাবুর কথাটার জবাব দিলেন অভয়াচরণ– সরোষে। বামুনের ছেলের দু' একদিন না খেলে কিছুই আসে যায় না। এমনই যদি ক্ষুধা হয় তাহলে কোন বাড়ি থেকে তিন মুষ্টি ভিক্ষা নিয়ে রান্না করে খেলেই চলবে।

আশাহত ক্ষুব্ধ অভয়াচরণ রওনা হবার জন্য পা বাড়ালেন। এমম সময় একজন সধবা স্ত্রীলোক তাঁর বিধবা মাকে সঙ্গে নিয়ে লোকনাথের জন্য পক্ক নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি সহ উপস্থিত হল। শিবরাত্রির পারণের দিন বলে ঐ মহিলা রাত্রিতেই ভোগ রান্না করে সকাল বেলায় আশ্রমে নিয়ে এসেছেন। সস্নেহে আহ্বান জানালেন দয়াল ঠাকুর।

—আয়, তোর খাবার এসেছে।

পিতৃস্নেহে পুত্রের রাগ জল হয়ে গেল। অভিমানের বাষ্পও নেই। অভয়াচরণ ফিরে এসে প্রসাদ গ্রহণ করতে বসলেন। অর্ধেকটা খাওয়া হতে লোকনাথ বললেন, এযে কায়েতের মেয়ে পাক করেছে—জাতবিচারের পরীক্ষা করছেন গোঁসাই। বিদ্রূপটা অভয়াচরণ বুঝলেন। বললেন :

হলইবা, আমি ত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করছি। চণ্ডালের মেয়ে পাক করলেও আপত্তি ছিল না।

খুশি হলেন লোকনাথ। আহারান্তে অভয়াচরণের দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ ধরে বললেন :

—সতের বৎসর পাহাড়-পর্বতে ঘুরেছিস, যার জন্য ঘুরেছিস তা পেয়েছিস ?

—না, পাইনি।

—যার জন্য ঘুরেছিস তা তোর হাতে বেঁধে দিলুম। আর ঘুরতে হবেনা। ঘুরলে কি হবে রে ? কর্মই ব্রহ্ম।

তারপর রজনী চক্রবর্তীকে (পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী) দেখিয়ে দিয়ে বললেন—ওর সঙ্গে যা। ওর কর্ম দেখ গিয়ে। ও যা আমিও তা। ও আমার সই-মোহরের নকল হয়েছে।

ঘরের পাশে মাণিক রেখে বৃথাই তা খুঁজে বেড়িয়েছে অভয়াচরণ। কিন্তু বৃথা নয়। সময় ও সুযোগের যোগাযোগ না

হলে কোন ঘটনাই ঘটে না। অপেক্ষা ত করতেই হবে যতক্ষণ না সময়-সুযোগ উপস্থিত হয়।

লোকনাথ বলেন—বাড়ির গরু বাড়ির ঘাস খায় না।

বারদীর নিকটেই গোবিন্দপুর। ঐ গ্রামনিবাসী অখিলচন্দ্র সেন এসেছেন ব্রহ্মচারীকে দেখতে। বাড়ির নিকটে তথাপি এতদিন সুযোগ হয়নি। কখনই বা সময় হয়। সাজগোজ বিলাস-ব্যসন নিয়েই ব্যস্ত। দিনের বেশির ভাগ সময় এভাবে কাটে, সাধু দেখবার ফুরসুৎ কখন হবে? তাছাড়া বাড়ির এত নিকটে একদিন গেলেই হবে। এই ছিল মনের ভাব।

সেই একদিন আজ। অখিল এসেছে জুতো, মোজা, কোট পরে; ঘড়ির চেইন লাগিয়ে—ফুলবাবুটি সেজে। দেখতে সুপুরুষ পোশাক-আশাকে মানিয়েছেও বেশ।

—বড় দেখি সাজ-সজ্জা করে এসেছিস?

অখিল অপ্রস্তুত হলেন, কিন্তু তা প্রকাশ পেতে দিলেন না। তাই লোকনাথের বলার সঙ্গে সঙ্গেই জবাব করলেন:

—এ যে দেব-মন্দির একে সাজাব না কাকে সাজাব?

প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রয়োজনীয় জবাব। যোগাযোগ। লোকনাথের মুখে উত্তর যোগাল না। খুশি হলেন অখিলের জবাব শুনে। তারপর কিছুদিন যাতায়াত। কোথায় গেল বিলাস-ব্যসন, কোথায়ই বা সাজ-সজ্জা? পরশ পাথরের ছোঁয়া লেগেছে। অখিলের সংসারে তাঁর মাতাঠাকুরাণী দুই স্ত্রী জীবিত থাকা সত্বেও অখিল নিলেন ব্রহ্মচর্য। নিলেন নতুন নাম, সুরথ ব্রহ্মচারী।

মথুরামোহন চক্রবর্তী। কলেজে এফ. এ ক্লাসে পড়েন। কি একটা উৎকট ব্যাধিতে ভুগছেন। নানা চিকিৎসা করেও ফল পাচ্ছেন না। খবর শুনেছেন, বারদীতে এসেছেন এক মহাপুরুষ.

সিদ্ধ যোগী, বাকসিদ্ধ। মুখ দিয়ে একবার কথা বেরুলেই হল। যা বলবেন তা হতেই হবে। শুনেছেন :

একবার এক ব্যক্তি জাল করার অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হলেন। তিনি আদালতে অপরাধ অস্বীকার করেন। কিন্তু পাপীর মন তাই বিচারের ফলাফল সম্পর্কে সন্দেহ। কল্পতরু বারদীর গোঁসাই। একবার গিয়ে ধরে পড়তে পারলেই হয়। তাঁর দয়া হলে আর কোন ভয় নেই। তাই ছুটে এসেছেন বারদী। লোকনাথের পা ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন, প্রভু আমি নিরপরাধ। দশচক্রে ভগবান ভূত। আমাকেও বুঝি তাই হতে হয়। শত্রুদের কুচক্রে মহাবিপদে পড়ে গেছি। তুমি দয়াময়, দুর্বলের আশ্রয়। আমাকে দয়া কর।

লোকটির কান্নাকাটি দেখে দেবতার মনে দয়া হল। তিনি অভয় দিয়ে বললেন :

—তোমার কোন ভয় নেই। তুমি মুক্তিলাভ করবে। ব্রহ্মচারী বাবার এক সেবক তিনি জানতেন ঐ ব্যক্তিকে এবং তার অপরাধের কথাও এঁর অজ্ঞাত ছিল না। তিনি উক্ত ব্যক্তিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন :

—মশাই আমি আপনাকে জানি। জানি আপনার অপরাধের কথা। কিন্তু মহাপুরুষের নিকট মিথ্যা বলে যে অভয়বাণী আদায় করেছেন, আপনার এই মিথ্যা আচরণের জন্য অভয়বাণী সভয়ে পরিণত হতে পারে। সুতরাং সময় থাকতে প্রভুর চরণ ধরে দোষ স্বীকার করে অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি চমকিত হলেন। ভাবলেন, সাধারণ মানুষকে ঠকান যায়, কিন্তু সাধু মহাপুরুষকে ঠকাতে গিয়ে নিজেকেই ঠকতে হয় নাকি কে জানে? সুতরাং এর পরামর্শ গ্রহণ করাই উচিত। ভীত সঙ্কুচিত মনে লোকনাথের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে নিজের

অপরাধ স্বীকার করলেন এবং তাঁর শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মচারী বললেন :

—যদি যথার্থ আমার শরণাপন্ন হয়ে থাক তা হলে আমি যা বলি সে রকম করতে পারবে কি ?

পরমশ্রদ্ধাসহকারে লোকটি বললেন :

—নিশ্চয়ই পারব।

—যাও, বিচারকের কাছে গিয়ে নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। আমি যে বলেছি মুক্তিলাভ করবে, সেকথার অন্যথা হবে না।

পাপীর অন্তরে অনুশোচনার দাহ। বাবার আদেশ শিরোধার্য করে আদালতে নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করলেন।

কিন্তু পূর্ব নথিদৃষ্টে ম্যাজিস্ট্রেট দেখলেন অভিযুক্ত ব্যক্তির বর্তমান উক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাবলেন, লোকটি ভয় পেয়ে বুঝি অপরাধ স্বীকার করছে। মোক্তারেরাও আসামীকে অপরাধ অস্বীকার করতে অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি অটল। মহাপুরুষের চরণস্পর্শে তার অন্তরের মালিন্য ঘুচে গেছে। দোষ করে শাস্তি নিতে এখন আর আপত্তি নেই। তাই সকলের উপদেশ অনুরোধ অবহেলা করে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন নিজের অপরাধ। শুধু এই আদালতে নয়, দায়রায় সোপর্দ হয়ে সেখানে এবং তারপর হাইকোর্টেও অপরাধ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলেন না।

মহাপুরুষের বাক্য অমোঘ। মুক্তি তিনি পেলেন। তাঁর স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও জজ তাঁকে মুক্তি দিলেন। দেবতার অনুগ্রহে পাপীর উদ্ধার হল।

চিকন্দীর উকিল ব্রজেন্দ্রকুমার বসু। বহুদিন শূল রোগে ভুগছেন। শান্তির আশায় এসেছেন লোকনাথের কাছে। ভক্ত

পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন লোকনাথ। ব্রজেন্দ্রবাবুও ভক্তদের মধ্যে বসে শুনছেন তাঁর অমৃতময় বাণী। হঠাৎ তাঁর শূলবেদনা শুরু হল। তিনি বেদনায় অস্থির হয়ে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন গোঁসাইর পা খানা যদি তাঁর বেদনার স্থানে ছোঁয়াতে পারতেন তা হলে বোধ হয় রোগমুক্ত হতে পারতেন।

—ওরে আমার পা টাতে ঝিঁঝিঁ ধরেছেরে, কেউ একটু টিপে দেত। মহাপুরুষের করুণার ইঙ্গিত। ব্রজেনবাবুর মনের আকাঙ্ক্ষা সাধু জানতে পেরেছেন তাই বুঝি এই ছল। উপযুক্ত সময়ের অসদ্ব্যবহার তিনি করলেন না। ব্যথাক্লিষ্ট ব্রজেনবাবু ছুটে এসে লোকনাথের পা নিজের ব্যথার জায়গায় স্পর্শ করিয়ে টিপে দিতে লাগলেন। ব্রহ্মচারী বাবার অপার করুণায় মুহূর্তের মধ্যে ব্রজেন-বাবুর শূলবেদনা নিরাময় হল।

করুণার অবতার লোকনাথ। কারো দুঃখ না পারেন দেখতে না পারেন সইতে। বারদীর এক ব্যক্তি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত। একটা চলতি প্রবাদ—যার হয় যক্ষ্মা তার নাই রক্ষা। মৃত্যু-বিভীষিকা রুগীর আতঙ্কিত মুখের উপর ছায়া ফেলেছে। ভীতি-বিহ্বল-রুগী নিয়েছেন দেবতার শরণ। শরণার্থীর আকুল আবেদনে দেবতার হৃদয় দিয়েছে সাড়া। করুণাময় নিলেন রাজব্যাধি নিজের দেহে আকর্ষণ করে। রুগী আরোগ্য হলেন। এমনি কত কাহিনী। নিত্য নব নব। ঘরের কাছে ঐশীশক্তি সম্পন্ন এত বড় মহাপুরুষের সংবাদে মথুরাবাবুর মনে এসেছে ভরসা। দূর থেকেই ভক্তিতে ভরে উঠেছে তাঁর মন। করুণাময়ের পাদপদ্মে সঁপে দিয়েছেন সব চিন্তা, সব ভাবনা—শুধু রোগের নয় সর্বরকম।

লোকনাথের চরণপ্রান্তে উপস্থিত মথুরামোহন চক্রবর্তী। নিবেদন করলেন অন্তরের প্রার্থনা। ভাবগ্রাহী লোকনাথ। ভক্তের হৃদয়ের আনাচে কানাচে পড়েছে তাঁর দৃষ্টি। কোন অন্তরাল,

কোন গোপনতা সেখানে নেই। ভক্তের ভগবান। করুণায় ভরে উঠল তাঁর মন। প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলেন—শুধু রোগমুক্তির নয় ঐহিক বাসনা পূরণেরও।

ছাত্র মথুরামোহন হলেন শিক্ষক, রেয়াইল স্কুলের হেড-মাস্টার। পরবর্তী জীবনে অধ্যক্ষ মথুরামোহন চক্রবর্তী ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। লোকনাথ করুণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পরমভক্ত মথুরাবাবু। মহাপুরুষের দয়ায় প্রাপ্ত ঐহিক উন্নতিতে আত্মহারা হয়ে যাননি। কৃতজ্ঞ চিত্তে আমরণ তিনি স্মরণ করেছেন বাবার পাদপদ্ম। ঢাকা বসুবাজারে মন্দির নির্মাণ করে লোকনাথ বাবার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করে নিত্য সেবা ও ভোগের ব্যবস্থা করেছেন। আজও সে ব্যবস্থা অব্যাহত।

বেজ-গাঁয়ের অধিবাসী যামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় ঢাকাতে ওকালতি করেন। লোকনাথের পরমভক্ত শিষ্য, লোকনাথকে দেখে, তাঁর স্নেহ-লাভ করে এত কৃতার্থ হতেন যে মনে হত মা-ও বুঝি তাঁকে এত স্নেহ করেন না। 'ব্রহ্মচারী কেমন'? কেউ প্রশ্ন করলে বলতেন—মূর্তিমান গীতা।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে এসেছেন বারদী, সঙ্গে রজনী চক্রবর্তী। সকালবেলা। লোকনাথ তখন 'বাল্য ভোগ' পাক করছেন। সকালবেলার বাল্য ভোগ লোকনাথ স্বহস্তে পাক করতেন। বিকালবেলার ভোগ পাক করতেন গোয়ালিনী মা। মুখ বন্ধ করে ভোগ রান্না করতে হত। ভোগের সময় কেউ সামনে যেতে পারত না। ধূপদীপ সহকারে ভোগের কাজ সম্পন্ন হত।

যামিনী ও রজনী বসে আছেন লোকনাথের বাস্তব্য ঘরের দক্ষিণের বারান্দায়। কিছুক্ষণ পরে লোকনাথ তাদের দু'জনকে ডেকে পাঠালেন। ততক্ষণে ব্রহ্মচারীর আহার শেষ হয়েছে, দুজনে

উপস্থিত হয়ে লোকনাথের নির্দেশে উপবেশন করলে তিনি দুজনের মুখেই ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : বল্ দেখি কি হচ্ছে ? কে কাকে খাইয়ে দিচ্ছে ?

রজনী বললেন— গুরু দিচ্ছেন শিষ্যকে।

—রেখে দে তোর গুরুশিষ্য, বাপ দিচ্ছেন বেটাকে।

যামিনীকে জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি কি বল।

—আপনি আমার মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন, আর আমি চিবিয়ে গলাধঃ করছি।

লোকনাথ বললেন :

—গুরু শিষ্যের এই পর্যন্তই করেন—মুখে উঠিয়ে দেন, শিষ্য নিজে চিবিয়ে উদরস্থ করবে। সত্যি তাই। মুখ পর্যন্ত তুলে দেওয়ার দায়িত্ব গুরুর। তাকে চিবিয়ে উদরস্থ করে তার সার দিয়ে দেহ ও মনের পুষ্টিসাধনের দায়িত্ব তাঁর নয়। গুরুদত্ত বস্তুর সার্থকতা আসবে তখন যখন শিষ্য তার চেষ্টায় নিজের উন্নতির সহায়ক হিসাবে তাকে গ্রহণ করতে পারবে।

যামিনীবাবু ও লোকনাথের কথোপকথন হচ্ছে। উপদেশ ছলে লোকনাথ বলছেন :

—যা ইচ্ছে তাই কর, দেখ যেন তাপ না লাগে।

—তাপ কি ?

—সুখে-দুঃখে, জয়-পরাজয়ে মনের যে অবস্থা তাই তাপ। যে অবস্থাতেই পড় না কেন সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে তাকে গ্রহণ করতে হবে।

সুখে আসবে না উচ্ছ্বাস, দুঃখে হবে না কাতর। জয়ে হবে না উল্লসিত, পরাজয়ের গ্লানিতে ভেঙে পড়বে না মন। মনের এই অবস্থাতেই যা কিছু করার কথা বলা হয়েছে। মানুষ তার মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লাভ করে ভালমন্দের বিচার ক্ষমতা।

যা নিকৃষ্ট, সমাজে নিন্দিত, তা সে তখন কিছুতেই করতে পারে না।

—গুরু কে ?

—ঠেকা। মানুষ ঠেকে শেখে। এই ঠেকাই গুরু। না ঠেকলে ত শেখা হত না।

—গুরু শিষ্যের কি করেন ?

শিষ্যের চোখ ফুটিয়ে দেন। যে অজ্ঞান সে অন্ধ। অজ্ঞানরূপ অন্ধের চোখ ফুটিয়ে দেন গুরু।

—বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, পুরাণ, গুরুগীতা, ভগবদ্গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও কি আবার গুরুর প্রয়োজন ?

—শাস্ত্র শাস্ত্রজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারে কিন্তু তাতে বিজ্ঞান লাভ হয় না। প্রত্যক্ষ অনুভূতি ব্যতীত কোন শাস্ত্রেরই সম্যক উপলব্ধি হয় না। প্রত্যক্ষ এই অনুভূতির জন্যই প্রয়োজন গুরুর। সকল শাস্ত্রই উপদেশ দিয়ে বলেছেন গুরুর কাছে পাঠ নিতে।

—বন্ধন ও মুক্তির কারণ কি ?

—মায়া। দেবীমায়াই সৃষ্টি করেছেন স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত জগৎ। আরাধনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তিনি অনুগ্রহ করে জীবকে মুক্তি দেন। "নৈকাদিত্যে দ্বিভোজনম্।" ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যা প্রয়োজন সেটুকুই আহার করা উচিত। ক্ষুধা না হলে খাওয়া উচিত নয়। ক্ষুধার পুজো করতে হবে, কিন্তু লোভের পুজো নয়।

"ন জাতু কামঃ কামান্ উপভোগেন শাম্যতি"—ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না। "হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"—আগুনে ঘৃত পড়ার মত। উপভোগ দ্বারা বাসনা বাড়ে বই কমে না। "মাহভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম—বিনা ভোগে কর্ম হয় না। এসব পরস্পর বিরোধী বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। প্রথম শ্লোক 'উপভোগেন' দ্বিতীয়তে 'অভুক্তম '। উপভোগ দ্বারা কর্ম বৃদ্ধি পায়, ভোগ দ্বারা হয় কর্মের ক্ষয়।

ভোগে ও উপভোগে প্রভেদ পতি ও উপপতি, পত্নী ও উপপত্নীর মত। বিচারপূর্বক ভোগ করা 'ভোগ', যথেচ্ছ ভোগ করা 'উপভোগ'। ভোগের জিনিস নিয়ে নাডাচাড়া করা এবং প্রকৃত রূপে সম্যক ভোগ না করাও 'উপভোগ'। যেমন সুখাদ্য জিনিস খেতে ইচ্ছা কিন্তু খেলে না, শুধু নেড়ে চেড়ে রেখে দিলে, তাও উপভোগ'।

প্রকৃতি দ্বিবিধ—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যাব পূজায় মুক্তি হয় অবিদ্যায় আসে বন্ধন। সময়ে এ দুয়ের সীমা নির্দেশ কঠিন হয়ে ওঠে। সে সংশয় নিরসন করে দেবেন গুরু।

ভোগ ও বাসনার নিবৃত্তির জন্য আস্তিক্য বুদ্ধির দ্বারা মনকে করতে হবে অন্তর্মুখী। প্রার্থনা করতে হবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ। তাঁর দয়া হলে অনায়াসেই ভোগবাসনার নিবৃত্তি হবে।

এই সংসার ত্রিবিধ তাপে পূর্ণ। বাক্যবাণ, বিত্তবিচ্ছেদবাণ ও বন্ধুবিচ্ছেদবাণ। যিনি এই তিনটি বাণ সহ্য করতে পারেন তাঁর মৃত্যুকে জয় করা কঠিন নয়। এই ত্রিবিধ তাপের ভয়ে অথবা মান সম্ভ্রমাদির লোভে যারা সন্ন্যাস নেয় তাদের কারো সন্ন্যাস হয় না। ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়া মানে সন্ন্যাস নয়। কর্মত্যাগ করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়ঃ।

বদ্ধাবস্থা মুক্তাবস্থার সিঁড়ি। হাতে বন্ধন থাকলেই তা খুলে দেবার কথা ওঠে। মুক্ত হতে হলে আগে বদ্ধ হতে হবে।

জীবের তিন অবস্থা। মুক্তাবস্থা, বদ্ধাবস্থা, মুক্তাবস্থা। প্রথম অবস্থায় পিতা, মাতা, বন্ধু ইত্যাদি বন্ধন বা সামাজিক বন্ধন থাকে না। যেমন পশু, পক্ষী, পার্বতীয় জাতি। দ্বিতীয়ে আসে সামাজিক

বন্ধন। যেমন তোমরা। তৃতীয়ে আসে পুনরায় মুক্তাবস্থা। যেমন আমি ও ত্রৈলঙ্গ স্বামী। জ্ঞান দ্বারা বিচার করতে করতেই আসে তৃতীয় অবস্থা।

—আমার ও আপনার কাজের প্রভেদ কি?

আমার এখানে এসে আমার কাজ দেখে বিচার কর তা হলেই বুঝবে। আমার এখানে লোকজন আহার করে তোমার বাড়িতেও লোকজন খায়। আমার এখানে যারা খায় তাদের জন্য আমার কোন চেষ্টা নেই। এও জানি আমি তাদের খেতে দি না। যার এখানে খাদ্য আছে সেই খায়, যার নেই সে আহার করে না। তাতে আমার কোন তাপও নেই। আমি জ্ঞানী, তুমি ঠিক তা নও। তুমি তোমার লোকজনদের খাওয়ার কথা ভাব। তাদের জন্য তোমার আছে চেষ্টা ও ভাবনা। তুমি মনে কর তুমি তাঁদের খাওয়াচ্ছ। খেতে দিতে না পারলে তোমার মনে আসে সামাজিক নিন্দার ভয়। তোমাব আছে কর্তৃত্বেব বোধ. আমার তা নেই।

দানে মনের উদারতা ও বৈরাগ্য এনে দেয়। বিচারে দেয় আত্মানাত্মবোধ। নিত্য ও অনিত্য বিবেক জন্মালে বিশুদ্ধ বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয় এবং জীব শিব হয়ে যায়। ভগবান সর্ব-ব্যাপী। সকলের হৃদয়ে তিনি আছেন। তাঁকে হৃদয়ে মানুষ যখন দেখে এবং তিনি আছেন বলে উপলব্ধি হয় তখনই তিনি অবতীর্ণ হন।

প্রারব্ধ কর্ম। শাস্ত্রকারেরা বাণের সাথে তুলনা করেছেন প্রারব্ধ কর্মের। একবার ধনুক থেকে ছেড়ে দিলে কর্তার আর তার উপর কোন হাত থাকে না। আপন গতিতে সে গিয়ে পড়ে, প্রারব্ধ কর্মও তেমনি। সৃষ্টির পূর্বের অবস্থায় সচ্চিদানন্দ অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্ম পূর্ণ জ্ঞানরূপে বিরাজ করতেন। 'একোঽহং বহুস্যাম'—এক আমি বহু হব বলে সঙ্কল্প করায় তা থেকে সৃষ্টি হল; তখন যার কপালে যা

লেখা হয়েছে অর্থাৎ যার সম্বন্ধে যে কর্ম নির্দিষ্ট হয়েছে হরি, হর, বা ব্রহ্মাও তার অন্যথা করতে পারেন না। সকলেই সেই সংকল্পের অধীন। এই সঙ্কল্পই প্রারব্ধ।

শ্যামাচরণ বক্সী বারদী এসেছেন। উদভ্রান্ত চেহারা, মুখ চোখ মলিন। নিদারুণ দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তিনি এসেই ব্রহ্মচারীর চরণে লুটিয়ে পড়লেন।

—আমার গুরুকে বাঁচিয়ে দাও। লোকনাথ গম্ভীর। ঈষৎ বিরক্তও বটে।

—এতদিন কি করেছ? এখন আর কিছু হবে না।

দ্বারভাঙ্গায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গুরুতর পীড়িত। তাঁর জীবন-সংশয়: ঢাকার আশ্রমে টেলিগ্রাম এসেছে। তাই শ্যামাচরণ এসেছেন ব্রহ্মচারীর কাছে। এ সংকটে তিনি ছাড়া ত্রাণ করার আর কেউ নেই একথা শ্যামাচরণ জানেন। উচিত ছিল খবর পেয়েই তাদের চলে আসা। এই ধীর মন্থরতার দরুণই ব্রহ্মচারীর অসন্তোষ। শিষ্যদের ত্রুটির জন্যই তাঁর এই আপত্তি।

প্রাণাধিক গুরু আজ মৃত্যু শয্যায়—ব্রহ্মচারীর বিরক্তিতে পিছ-পা হলে ত চলবে না। যে ভাবেই হোক তাঁকে রাজী করাতেই হবে গুরুর প্রাণরক্ষার জন্য। তাই পা ছেড়ে তিনি উঠছেন না।

—তুমি দয়াময়। দয়া কর, আমার গুরুর প্রাণ ভিক্ষা দাও।

লোকনাথের হৃদয় তবু টলছে না। পাষাণ দেবতা! না, কিছু হবে না।

আকুলস্বরে শ্যামাচরণ বলছেন:

—হবে প্রভু, হবে। তুমি দয়া করলেই হবে।

—না, হবে না। আর আয়ু নেই।

—আয়ু নেই! আর্তনাদ করে উঠলেন শ্যামাচরণ। তাঁর দুটি চোখ বেয়ে নেমে আসে শ্রাবণের ধারা।

—আমার পরমায়ু নাও। আমার আয়ু দিয়ে ওঁকে বাঁচিয়ে তোল। নইলে আজ তোমার পায়ের কাছে সমস্ত পরমায়ু শেষ করে দেব।

—কি বললি? লোকনাথের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

—তোমার অসাধ্য কিছু নেই। তুমি দেবতা। আমার আয়ু দিয়ে আমার গুরুকে বাঁচিয়ে তোল।

অপূর্ব গুরুভক্তি! লোকনাথ জানেন গুরুর মহিমা। গুরুর জন্য শিষ্যের এই আত্মত্যাগের সঙ্কল্প তাঁর হৃদয় স্পর্শ করল। করুণায় আনন্দে ভরে উঠল তাঁর বুক। তিনি শ্যামাচরণকে অভয় দিলেন। বললেন:

—তোমার গুরুভক্তি এযাত্রা তোমার গুরুর প্রাণ রক্ষা করল। তুমি ঢাকা ফিরে যাও। আমি জীবনকৃষ্ণের (বিজয়কৃষ্ণকে তিনি জীবনকৃষ্ণ বলতেন) কাছে যাচ্ছি। পরশু তোমরা খবর পাবে।

দ্বারভাঙ্গা। বিজয়কৃষ্ণ শয্যাশায়ী। শিষ্য, ভক্ত, আত্মীয়জন রোগশয্যার নিকট উপস্থিত। অসীম আগ্রহে তাঁরা রুগীর অবস্থা লক্ষ্য করছেন। প্রতি মুহূর্তে জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা। বিচক্ষণ দু'জন ডাক্তার এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। কঠিন উদরী রোগে তিনি আক্রান্ত। কিছুদিন যাবৎ এই রোগে ভুগছিলেন। এখন রোগের অবস্থা চরম অবস্থায় উপনীত। অন্ত্র পচে গেছে। ডাক্তারদের চিকিৎসার অতীত। আর আধ ঘণ্টার ভেতর মৃত্যু অবধারিত বলে ডাক্তাররা চলে গেলেন।

ভক্ত, শিষ্য, আত্মীয়দের মুখের উপর নেমে এসেছে হতাশার কালো ছায়া। আসন্ন শোকে সকলেই মুহ্যমান। প্রিয় শিষ্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে শেষবারের মত

পদসেবা করছেন। মাথার ধারে বসে আছেন বিজয়কৃষ্ণের শ্বশুর। পুত্রাধিক প্রিয় জামাতার সম্ভাব্য বিয়োগব্যথায় হৃদয় ভারাক্রান্ত। অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে শেষক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করছেন। উপস্থিত সকলের চোখে জল। তাদের পরম শ্রদ্ধেয়, পরম আত্মীয় চলেছেন তাদের মায়া মমতা ত্যাগ করে। সংসারের কোন শক্তিই আজ তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারবে না মৃত্যুর কঠিন বন্ধন থেকে। নৈরাশ্যে, বিষাদে ভেঙে গেছে বুক। অসহায়ের মত ভেতর থেকে উঠছে করুণ আর্তনাদ—আর কোন আশা নেই।

—জীবনকৃষ্ণ!

একসঙ্গে যেন শত বজ্রপতন। তড়িতাহতের মত গৃহস্থিত সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আওয়াজ লক্ষ্য করে সকলে চেয়ে দেখেন জটাজুটধারী দীর্ঘদেহ, স্থিরদৃষ্টিসম্পন্ন এক ব্রহ্মচারী। মৃত্যুপথ-যাত্রী বিজয়কৃষ্ণের হাত ধরে টেনে বিছানায় বসিয়ে দিতে দিতে তিনি বলছেন:

—জীবনকৃষ্ণ উঠে বস। এই দেখ আমি এসেছি।

পর্যাপ্ত ঘুমের পর প্রিয়তম সন্তানের হাত ধরে তুলে জাগিয়ে দিচ্ছেন স্নেহময় পিতা। ঘুম ভেঙে উঠে বসে বিজয়কৃষ্ণ চোখ চেয়ে দেখেন। বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা নেই।

—ব্রহ্মচারী বাবা! বাবা লোকনাথ! তুমি?

—হ্যাঁরে তুই অসুস্থ। শ্যামাচরণ আমাকে পাঠিয়ে তবে ছাড়ল। ভাল হয়ে গেছিস। এবার আমি যাই।

—কিন্তু—। বিজয়ের বলা হল না। ব্রহ্মচারী অন্তর্ধান করেছেন।

যথাসময়ে শ্যামাচরণ অবগত হলেন তাঁর গুরুর আরোগ্য সংবাদ। ঢাকার আশ্রমে টেলিগ্রাম এসেছে শীঘ্রই তিনি ঢাকা আসছেন। কিছুদিন পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা এসে

সপরিবারে একদিন বারদীতে উপস্থিত। আশ্রমবাসীদের নিকট গোপন অনুসন্ধান করে জানলেন ব্রহ্মচারী বাবা ইতিমধ্যে আশ্রম ছেড়ে কোথাও যান নি। বুঝলেন সেদিনকার তার উপস্থিতি সূক্ষ্মদেহে, স্থূলদেহে নয়। আনন্দে বিস্ময়ে ব্রহ্মচারীর পদতলে লুটিয়ে পড়ে বিজয় জানালেন তার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা। সেই সঙ্গে উপলব্ধি করলেন যোগ-সিদ্ধির অলৌকিক ক্ষমতা।

ঢাকা জজ আদালতের উকিল শ্রীবিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মচারী বাবার সঙ্গে দেখা করতে বারদী এসেছেন। ব্রহ্মচারী তাঁর আশ্রমে নিজ বসত ঘরের ভেতর বসে আছেন। ভক্ত শিষ্য বসে শুনেছেন তাঁর অমৃতময় বাণী। শিষ্যদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ভারতী মশাইও বসে আছেন।

বিহারী এসে লোকনাথের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। তারপর ভক্তদের ভেতর গিয়ে বসলেন। লোকনাথ প্রশ্ন করলেন :

—বিহারি! তুই কি ইতিমধ্যে আমাকে স্মরণ করেছিলি?

—আজ্ঞে বাড়িতে এসে আপনার পাদ-পদ্ম দর্শন করার ইচ্ছা হয়েছিল বই কি।

—বাড়িতে এসে? না তা নয়, জল পথে কখনও স্মরণ করেছিস?

জল পথে!—সত্যিইত। সত্যই সেদিন কি আকুলভাবে ব্রহ্মচারীকে ডেকে মন প্রাণ সমর্পণ করেই স্মরণ করেছিলেন তাঁর অভয়পদ—এইত সেদিন, বেশিদিনের কথা নয়। বিপন্মুক্ত হয়ে আজ ভুলে গেছেন সে কথা। ধিক তাকে, অকৃতজ্ঞ, মানুষ নামের অযোগ্য।

খুব বেশিদিনের কথা নয়। বিশেষ কার্যোপলক্ষে তিনি গিয়েছিলেন চট্টগ্রাম। ফেরবার পথে স্লুপে চড়ে সমুদ্রপথে

আসছিলেন। দেশী নৌকো হলেও সমুদ্রপথে চলার উপযোগী করেই শ্লুপ তৈরি করা হয়। আকারেও বেশ বড়। শ্লুপে সেদিন অনেক যাত্রী ছিল। সহসা সমুদ্রে ঝড় উঠল। সমুদ্রের ঝড়। ভুক্তভোগী ভিন্ন এর ভীষণতা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। ঝড়ের মাতনে সমুদ্রে আজ প্রলয় নাচন। ছোট ছোট পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে ঢেউগুলি ছুটে আসছে মৃত্যুর বার্তা নিয়ে। প্রতিটি ঢেউয়ের আঘাতে শ্লুপখানি আন্দোলিত হচ্ছে। বিপর্যস্ত করে তুলছে যাত্রীদের হৃদয়, প্রতি মুহূর্তে দেখছে তারা মৃত্যু-বিভীষিকা, কোন উপায় নেই। সাগরের রোষবহ্নির নিকট আত্মাহুতির সময় আসন্ন। যাত্রীরা যার যার ধর্ম বিশ্বাসানুযায়ী ডাকছে তার উপাস্য দেবতাকে উচ্চ কণ্ঠে প্রাণখুলে—কঠিন এই বিপদ থেকে ত্রাণ করার জন্য। বিহারীবাবুর স্মরণ হল লোকনাথের কথা।

—জয় বাবা লোকনাথ। দয়া কর বাবা, রক্ষা কর ভয়সন্ত্রস্ত এতগুলি নরনারীর প্রাণ। দেখ, যেন তোমার অভয় নামের কলঙ্ক না হয়।

না, নামের কলঙ্ক সেদিন হয়নি। বাবা তাদের রক্ষা করেছেন। শ্লুপের ভেতরকার অনেক নরনারী দেখেছে একখানি অভয়হস্ত, শুনেছে অভয়কণ্ঠের বাণী—ভয় নেই।

সজল চোখে বর্ণনা করলেন বিহারী সেদিনকার ভয়াবহ সেই কাহিনী। বিস্ময়বিমুগ্ধ শ্রোতার দল শুনলেন বাবার অলৌকিক ক্ষমতার কথা। ভক্তের প্রতি, শিষ্যের প্রতি তাঁর সীমাহীন করুণার পরিচয় পেলেন। শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে সকলের হৃদয় ভরপূর।

ঢাকা পশ্চিমদী নিবাসী রাধিকামোহন রায়, বাতব্যাধিতে অর্ধাঙ্গ অবশ। নানাপ্রকার চিকিৎসাতেও কোন ফল হচ্ছে না।

তাঁর স্ত্রী স্বামীকে নিয়ে এলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশাই-এর কাছে দৈববলে রোগমুক্তি হওয়ার আশায়। গোস্বামী মশাই তাঁকে উপদেশ দিলেন ব্রহ্মচারীর করুণাপ্রার্থী হওয়ার জন্য।

রাধিকামোহন কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বৈষয়িক লোক। অর্থবান! চরিত্রের সুনাম ছিল না। ধর্মকর্মেও ছিল না কোন প্রকার আস্থা। বিলাস ব্যসনে কাটিয়েছেন জীবনের বেশির ভাগ। চরিত্রহীনতার পরিণামেই এই ব্যাধি। স্ত্রীর সঙ্গে লৌকিক সম্পর্ক ব্যতীত অন্য সব সম্পর্ক অনেক দিন হয় ছেড়েছেন। বাইরের আকর্ষণে গৃহের পবিত্র আহ্বান উপেক্ষা করেছেন। সতী স্ত্রীর চোখের জল, অনুনয় বিনয় সমস্তই হয়েছে ব্যর্থ। উপেক্ষিতা নারী হৃদয়ের বেদনা অভিশাপ নিয়ে দেখা দিল রাধিকামোহনের জীবনে। এল দুরন্ত এই ব্যাধি।

গোস্বামী মশাই-এর উপদেশ মত একখানা কোষ নৌকো ভাড়া করে সপরিবারে রাধিকামোহন বারদীর ঘাটে এসে নোঙর করলেন। সতী সাধ্বী রাধিকামোহনের স্ত্রী। ভুলে গেছেন অতীতের সমস্ত কথা। স্বামীর দেওয়া সমস্ত দুঃখ, তাঁর অনাবিল প্রেমের অপমান, ব্যথা বেদনার অশ্রুজল, সমস্তই আজ ধুয়ে মুছে গেছে স্বামীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে। স্নেহে মমতায় ভরে উঠেছে সমস্ত হৃদয়। স্বামী সেবায় উন্মুখ প্রেমময়ী নারী। রোগ-মুক্ত করে নিরাময় করে তোলার সবরকম উপায় উদ্ভাবনে যত্নবতী। দেহে মনে স্বীকার করেছেন সবরকম পীড়ন, স্বামীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আকাঙ্ক্ষায়। বারদীর ঘাটে স্নানাদি সম্পন্ন করে পবিত্র-ভাবে ভক্তিযুক্ত মনে স্বামীসহ উপস্থিত হলেন আশ্রমের কুটিরে। সেখানে বহু ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন অধম-তারণ পাপী-তাপীর উদ্ধারকর্তা যুগমানব লোকনাথ।

সাষ্টাঙ্গে চরণে প্রণিপাত করে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্রহ্মচারীর সম্মুখে

অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে। স্নেহ-মধুর দুটি চোখ বেয়ে নেমে আসছে শ্রাবণের ধারা—স্ত্রীর স্বর্গীয় প্রেমের পূত মন্দাকিনী। অন্তর্যামী লোকনাথ। রাধিকামোহনের কোন কথা তাঁর অগোচর নয়। কঠিন হয়ে উঠল তাঁর মন। স্ত্রী-পীড়নকারী দুর্বৃত্তকে কঠিন শাস্তি দেবার জন্য হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠতে চাইল। কণ্ঠে ধ্বনিত হতে চাইল নিদারুণ অভিশাপ। কিন্তু ক্রোধকে সংহত করলেন; সমস্ত শক্তি রূপান্তরিত হল করুণায়। লক্ষ্মীরূপিণী যে সাধ্বীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে আজ রাধিকার এই অবস্থা, তিনিই আজ দণ্ডায়মানা দুশ্চরিত্র স্বামীর রোগমুক্তির কৃপা প্রার্থনা নিয়ে। স্বর্গীয় দেবী মূর্তি। হিন্দু নারীর চিরন্তন আদর্শ। সাবিত্রী, বেহুলার প্রতিমূর্তি। মহাপুরুষ কি পারেন মহিয়সী এই নারীর আবেদন অগ্রাহ্য করতে! পারেন কি সতীর চোখের জল দেখে স্থির থাকতে। দেবতার অধরোষ্ঠ কেঁপে উঠল, তিনি শোনালেন অভয় বাণী। হাত তুলে রাধিকামোহনকে করলেন আশীর্বাদ। সতীর পুণ্যে আজ তিনি ফিরে পেলেন জীবন। নবজীবনের সঙ্গে ফিরে এল শুভ বুদ্ধি, দৃষ্টি হল স্বচ্ছ—জীবনে এল নূতন অনুভূতি।

কলকাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ ধনী সীতানাথ দাস। বাত-ব্যাধি রোগে আক্রান্ত। দূর থেকেই শুনেছেন বাবা লোকনাথের নাম, তাঁর অলৌকিক শক্তির কাহিনী। তাই পদ্মা মেঘনা পার হয়ে এসেছেন বারদী। বড় রকমের বজরা নৌকো ভাড়া করে দাসদাসী নিয়ে নদীর ঘাটে আছেন। কষ্ট করে অন্যের সাহায্যে আশ্রমে যান, মহাপুরুষের নিকটে বসেন, শোনেন ভক্তদের প্রতি তাঁর উপদেশের কথা। আবার নৌকোয় ফিরে আসেন। কিন্তু লোকনাথের কৃপা বর্ষণ হয় না।

একদিন সীতানাথ ভাবলেন—মহাপুরুষের চরণতলে যখন

আশ্রয় নিতে এসেছেন তখন এই আশ্রম আঙ্গিনাতেই পড়ে থাকবেন, অগ্রাহ্য করবেন ঝড়, জল, রোদ। যদি মহাপুরুষের কৃপা হয় তাহলে জীবনরক্ষা হবে, না হলে মহাপুরুষের চরণসান্নিধ্যে মৃত্যুই হবে বাঞ্ছনীয়। সঙ্কল্পে মন হল দৃঢ়। তাই তিনি তাঁর দাস দাসীদের পাঠিয়ে দিলেন নৌকোয়—তিনি রইলেন উন্মুক্ত আকাশ-তলে আচ্ছাদনহীন আশ্রম আঙ্গিনায় একখানা খাটের উপর শয়ন করে।

দু'দিন দু'রাত চলে গেল। বৃষ্টি, রোদের উত্তাপ কোন কিছুতেই তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারেনি। আমরণ এই কৃচ্ছ্র-সাধনায় তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর আত্মীয়-স্বজন দাসদাসীরা তাঁকে ঐরূপ দুর্দশাপন্ন দেখে নৌকোয় ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগল। কিন্তু সীতানাথ অচল অটল।

মহাপুরুষ কাকে কি ভাবে পরীক্ষা করেন কে জানে? যেখানে ভক্তি ও নির্ভর যত গভীর পরীক্ষাও সেখানে তেমনি গুরুতর। তৃতীয় দিনে দেবতার আসন টলে উঠল। ভক্তের কাতরতায় কেঁদে উঠল তাঁর প্রাণ। ভোর হতেই সীতানাথের কাছে গিয়ে করলেন করুণার শীতলস্পর্শ। সীতানাথের দেহে এল নূতন জীবনের জোয়ার। তড়িতস্পৃষ্টের মত সচকিত হয়ে উঠল সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। দেবতা হেসে বললেন, তোকে বড় কষ্ট দিয়েছি, এখন ওঠ।

অচল বাতব্যাধিগ্রস্ত রুগী মন্ত্রচালিতের মত শয্যার উপর উঠে বসলেন। ব্রহ্মচারীর হস্তস্পর্শে মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে গেল এতদিনের দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধি। সীতানাথের মুখে ফুটে উঠল নব জীবনের উল্লাস। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল হৃদয়, শ্রদ্ধাভক্তি-ভারাবনত মস্তক। ভক্তিতে ভগবান হয়েছেন বশ। ভক্তের বাসনা হয়েছে পূর্ণ। আশ্রম থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে ব্রহ্মচারী সীতানাথকে করলেন আশীর্বাদ।

তোমার নিজের দেহ, মন, প্রাণ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি আমাকে অর্পণ করে আমার উঠানে বৃষ্টিতে ভিজেছ, রোদে শুকিয়েছ। আমি তোমার জন্য কেঁদেছি, এখন তুমি সুস্থ ও সবল হয়েছ। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তা আমারই রইল, কিন্তু আমি দিলাম তোমাকে তার ভোগাধিকার।

দেবতার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সীতানাথ ফিরে চললেন তার দেশে।

পেনসনপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর। তাঁর স্ত্রী রুগ্না। অধুনা রোগিনীর বাকরোধ হয়েছে। আহার নেই, নিদ্রা নেই, নেই আহারের স্পৃহাও। খাদ্যবস্তু মুখে দিলে থু থু করে ফেলে দেন। ডাক্তারী, কবিরাজী মতে চিকিৎসা হয়েছে, তাতে ফল হয় নি। তারপর করেছেন শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি ; কিন্তু বৃথা। বারদীর গোঁসাইর নাম তখন আকাশে বাতাসে। চন্দ্রকুমার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এলেন বারদী। বাবার চরণে স্ত্রীকে করলেন সমর্পণ।

—বাবা দয়া কর। স্ত্রীকে কর রোগমুক্ত।

বাবা নীরব। বুঝতে চাইলেন স্বামীর মন, প্রেমের আন্তরিকতা। চন্দ্রকুমার বাবার চরণতলে মাথা পেতে রইলেন।

—কথা দাও নইলে মাথা তুলব না।

বাবা বললেন :

—আমি ব্রাহ্মণ হয়েছি কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য বাক্য দ্বারা চুরানব্বইটি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য করেছি। এখন আর আমার সে স্পৃহা নেই। তবে কেউ যদি ইচ্ছে করিয়ে নিতে পারে তবে এখনও আরোগ্য হয়।

—ইচ্ছে করিয়ে নেয় কি প্রকারে ? চন্দ্রকুমার প্রশ্ন করেন।

—ক্ষুৎনিবারণের জন্য দেহের যেরূপ প্রয়োজনবোধ, মলমূত্র

ত্যাগের জন্য দেহের যেমন প্রয়োজনবোধ, ঠিক সে রকম প্রয়োজন বোধ যার আমার জন্য থাকে সে এখনও আমাকে দিয়ে ইচ্ছে করিয়ে নিতে পারে।

চন্দ্রনাথ বুঝলেন ব্রহ্মচারী বাবার কথার ইঙ্গিত। পরীক্ষা কঠিন। এই পরীক্ষকের কাছে দিতে হবে আন্তরিকতার পরীক্ষা। ফাঁকি এখানে চলবে না। কৃত্রিমতার সামান্য চিহ্ন তাকে এনে দেবে পরাজয়ের গ্লানি তথাপি চন্দ্রনাথ দমলেন না। হৃদয় উন্মুক্ত করে দেখাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। এতদিনের দাম্পত্যপ্রণয়ে যদি কোন খাদ থাকে, পরীক্ষার এই আগুনে পুড়ে তা নিঃশেষ হয়ে যাক, যা খাঁটি তার সত্যিকারের পরিচয় নিয়ে এসে দাঁড়াক লোকচক্ষুর সামনে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন চন্দ্রবাবু। বাবা দয়া করেছেন। বলেছেন স্ত্রীকে আশ্রমে রেখে যাওয়ার জন্য। তিন মাস স্ত্রী আশ্রমে রইলেন। আশ্রমেই প্রসাদ পেতেন। আহারে রুচি ছিল না। এখন খেতে পারেন। মুখেও কথা ফুটেছে। বহুলোক এসেছে বোবার মুখে কথা শোনার জন্য। কি আশ্চর্য! বাবার দয়ায় বোবাও কথা বলে! পথেঘাটে লোকের মুখে শুধু এই কথা।

চন্দ্রকুমার এসেছেন স্ত্রীকে নিয়ে যেতে। বাবার অনুমতি চাইলেন।

—নিয়ে যেতে চাস?

—তোমার উপর নির্ভর। তুমি যা বল তাই করব।

বাবা বললেন:

—একথাও কথা নয়। কাল হয়ত একথা থাকবে না। আরও কয়েকদিন রেখে যা।

কথানুযায়ী রেখে গেলেন এবং এক মাস পরে এসে স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন। তখন তিনি আধ আধ কথা বলেন। স্ত্রীর সঙ্গে ছিল

দুটি ছেলে। একটির হল আমাশয় আর একটির জ্বর। বাবার প্রসাদ পেয়ে উভয়েই ভাল হয়ে মায়ের সঙ্গে দেশে ফিরে গেল।

বুড়িগঙ্গার তীরে প্রত্যহ বেড়াতে যান চন্দ্রনাথ রায়। ঢাকার তথা সমগ্র পূর্ব বাংলার একজন বিখ্যাত গায়ক। একদিন দূর থেকে অদ্ভুত এক মূর্তি দেখে সামনে গিয়ে দেখতে পেল সমস্ত গায় মাটি মেখে বসে আছেন ডেপুটি পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর অভিনব এই মূর্তি দেখে তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগল চন্দ্রনাথ রায়ের। তাই চন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন:

কি গো ডেপুটিবাবু! আপনার এ দশা কেন?

চন্দ্রনাথের প্রশ্ন শুনে পূর্ণবাবু গদগদ কণ্ঠে উত্তর করলেন—আমি দারুণ মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বারদীর মহাত্মা লোকনাথের কাছে গিয়েছিলাম। মহাপুরুষের কৃপায় সে ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছি। বাবা বলেছেন গায়ে কয়েকদিন মাটি মেখে বসে থাকতে। তাহলে রোগের পুনরাক্রমনের সম্ভাবনা আর থাকবে না। তাই মহাত্মার মহান শক্তির কথা সাধারণ্যে প্রচারের জন্য এভাবে গায়ে মাটি মেখে প্রকাশ্য স্থানে বসে থাকি। অবিশ্বাসী শ্রদ্ধাবিহীন লোকেরা জানুক যে এখনও ভারতে এরকম অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষেরা আছেন এবং শ্রদ্ধাবানের কাছে তাঁরা প্রকাশিত হন।

চন্দ্রনাথ রায় শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। লোকমুখে শুনেছেন ব্রহ্মচারীর কথা। কিন্তু তিনি যে এত শক্তিসম্পন্ন এ ধারণা তাঁর ছিল না। তাই সঙ্কল্প করলেন বাবাকে দর্শন করে এবং তাঁর সুশীতল চরণছায়ায় আশ্রয় নিয়ে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ করবেন।

বর্তমানে চলছে সেই যুগ যে যুগে মানুষের ভেতর প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে এসেছে অবিশ্বাস ; ব্রহ্মচর্য, যোগ সাধনা ইত্যাদিতে হয়েছে অশ্রদ্ধা—যা-কিছু অতীত তাকেই তারা করছে অবহেলা। বিজ্ঞানের যুগ—প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর তার ভিত। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ নির্ভর করে পরীক্ষার উপর। বিনা পরিশ্রমে তা হয় না। কিন্তু এই পরিশ্রমটুকু স্বীকার করতে বর্তমান যুগ নারাজ, অতীতের সবকিছু প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতার জন্য। জ্ঞান-স্পৃহার লক্ষণ ত এ নয়, এ শুধু নূতনত্বের মোহ—জ্ঞানের বিলাস। শুধু ব্রহ্মচর্য সাধন দ্বারা কত বড় শক্তি অর্জন করা যায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ লোকনাথের সবরকম শাস্ত্রে পারদর্শিতা, ত্রিকালদর্শিতা, অন্তর্যামিত্ব। সব কিছুর পূর্ণ প্রকাশ শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর ভেতরে।

ব্রহ্মচারীর যোগ-ঐশ্বর্যের কথা শুনে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর তাঁর বন্ধু ও আত্মীয় মহেন্দ্রকুমার ঘোষকে সঙ্গে করে বারদী এলেন। ঈশ্বর ঘোষ ঢাকা জজ আদালতের সরকারী উকিল, ঢাকা কলেজের আইনের অধ্যাপক। স্বনামধন্য ব্যক্তি।

দলে এঁরা প্রায় দশজন। আশ্রমে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মচারীর চরণধূলি নিলেন। তারপর আশ্রমে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলেন। রায় বাহাদুরের মনটা একটু ক্ষুণ্ণ। তাঁর মর্যাদানুযায়ী অভ্যর্থনা ব্রহ্মচারী বাবার কাছ থেকে তিনি পান নি। যদিও এজন্য অভিযোগ করার কিছু নেই—কেননা মহাপুরুষের কাছে সম্মানিত বা সাধারণে কোন ভেদ নেই এবং এ জাতীয় পক্ষপাতিত্ব-শূন্য ব্যবহার এঁদের কাছ থেকে সকলেই আশা করেন। তবু রায় বাহাদুরের মনে সামান্য একটু ক্ষোভ মাঝে মাঝে সাড়া দেয়। প্রথম সাক্ষাতেই ব্রহ্মচারীর রূঢ় ব্যবহারটা খুব পীড়াদায়ক হয়েছে সন্দেহ নেই।

দ্বিপ্রহরে আহারের সময় সকলকে ডেকে খেতে দেওয়া হল। লোকনাথ নিজে সামনে থেকে যত্নসহকারে আহার করাচ্ছেন। লোকনাথের নির্দেশে রায় বাহাদুরকে দেওয়া হল এক বাটি দুধ ও কয়েকটি সুরভি কলা। ঈশ্বর ঘোষ ভুগছেন উদরাময় রোগে। দুধ কলার ব্যবস্থা দেখে মনে মনে একটু ভীত হলেন। কিন্তু কিছু বলার বা আপত্তি জানানোর সুযোগ হল না। ব্রহ্মচারী বাবার নির্দেশে তিনি দুধ কলা সবটুকুই খেলেন। খাওয়ার আগ্রহ ও আদরযত্নের আন্তরিকতায় রায় বাহাদুরের মনের ক্ষোভ আর নেই। আহারের পর বেল গাছের নীচে গিয়ে সদলবলে বিশ্রাম করতে বসলেন।

আশ্রমে আর কোন ঘর নেই। লোকনাথ থাকেন তাঁর প্রস্তুত ছনের ঘরে। আর একখানা ঘরে গোয়ালিনী-মা লোকনাথের জন্য ভোগ রান্না করেন। যাত্রী বা ভক্তেরা আশ্রমের বারান্দায় বা বেল গাছের তলায় থাকার স্থান করে নেয়। সমর্থ যারা তারা থাকে নৌকো ভাড়া করে নদীর ঘাটে।

বেলতলায় একটি বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগী। এসেছে বাবার নাম শুনে তাঁর অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষায়। সদলবলে ঈশ্বর ঘোষ বসলেন তার বিছানায়। আরও অনেকে এসে বসেছে দ্বিপ্রহরের অবসর যাপনের আশায়। নানাপ্রকার আলোচনা হচ্ছে। সব আলোচনাই লোকনাথকে উপলক্ষ্য করে—তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা।

বারদীর এক ব্যক্তির কথা উঠল। পায়ে হয়েছে তার সর্পাঘাত। অল্প সময়ের মধ্যে বিষের ক্রিয়া সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলল। নানাদিকে লোক ছুটে নিয়ে এল ছোট বড় নানারকম ওঝা। আত্মীয়েরা করল বাবাকে মানত। ভাল হয়ে গেলে পূজা দেবে। ওঝা বৈদ্যের চিকিৎসা চলছে। রোগী মনে মনে ডাকছে বাবা লোকনাথকে। বাবা রক্ষা কর, তোমাকে পুজো দেব। বিষ

নেমে গেল। রোগী ভাল হয়ে উঠল। তখন আত্মীয়েরা মনে করল সাপে কাটা বিষটিষ নামানোর বৈদ্য একমাত্র ওঝারাই। সুতরাং বিষ নামানোর সমস্ত কৃতিত্ব ওঝাদেরই প্রাপ্য। রোগীরও তাই মনে হল।

দিন যায়! হঠাৎ একদিন রোগীর সেই সর্পদষ্ট স্থানে দেখা দিল বেদনা এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বিষের ক্রিয়া। রোগী অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আত্মায়েরা ভীত হয়ে উঠল, বুঝল মানসপূজা না দেওয়ার এই শাস্তি। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল বাবার কাছে, অনেক কাকুতি মিনতি করে মানসপূজা না দেওয়ার অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা করল। করুণাময় লোকনাথ। ভিজে গেল তাঁর মন। তিনি ওদের মার্জনা করলেন। রোগী ভাল হয়ে গেল।

বারদীর জমিদার অরুণকান্ত নাগ এসেছেন লোকনাথের কাছে একটা জরুরী বিষয়ে পরামর্শ নিতে। এরকম প্রায়ই তিনি করেন। জমিদারি সংক্রান্ত কোন গুরুতর ব্যাপার হলেই অন্যান্য শরিকরাও ব্রহ্মচারী বাবার উপদেশ নেন।

অরুণবাবুর কাজের তাড়া। তাই তিনি সরাসরি ঘরে ঢোকার উপক্রম করতেই লোকনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন :

—ওরে থাম, থাম। ঘরে ঢুকিস না, আমার পরিবার আছে।

অরুণবাবু হকচকিয়ে গেলেন। কি ব্যাপার! গোঁসাইর পরিবার। কৌতূহলে ভরে উঠল মন। কিন্তু আদেশ অমান্য করা যায় না। তাই বারান্দায় অপেক্ষা করে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে গোঁসাই ডাকলেন। এবার এস।

কৌতূহলাক্রান্ত অরুণবাবু ঘরে ঢুকে দেখেন বিরাট এক পিপীলিকা বাহিনী ব্রহ্মচারী প্রদত্ত খাদ্যবস্তু মুখে নিয়ে সৈন্যদলের ন্যায় চলেছে। এতক্ষণে তারা বাবার দরজা ছাড়িয়ে চলে গেছে। এবার বুঝলেন তিনি ঘরে ঢুকতে নিষেধ করার তাৎপর্য। উদ্বেগ-পীড়িত মন নিয়ে অরুণবাবুর গৃহ প্রবেশের মুখে সতর্ক দৃষ্টি না

থাকারই ছিল সম্ভাবনা। সুতরাং তার ব্যস্ততার দরুণ পদদলিত হয়ে এই পিঁপড়েদের প্রাণ যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

আশ্রমের সেবক ভজলেরাম। বলছে বাবার কীর্তির কথা। একবার তার বাঘ দেখার বড় ইচ্ছে হয়। সে জীবনে কোনদিন বাঘ দেখেনি। বাবার মত এতবড় মহাপুরুষের পদাশ্রয়ে থেকেও জীবনের সাধারণ এই সাধটুকুও যদি না মেটে তাহলে বৃথাই এতদিন বাবার সেবা করা। অন্তর্যামী বাবা ভজলেরামের মনের কথা টের পেলেন। রাত্রি শেষে ভজলেরামকে বাবা ডেকে তুললেন:

—ওরে বাঘ দেখতে চেয়েছিলে না? ওঠ শিগগির, ঐ দেখ বাঘ এসেছে।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে ভজলেরাম চেয়ে দেখে উঠানে দাঁড়িয়ে একটি জানোয়ার। তাদের আশ্রমের আদরী বিড়ালের মত। তবে আকারে অনেক বড়, গায় ডোরা ডোরা দাগ। প্রাণ ভরে বাঘ দেখে ভজলেরাম তার জীবনের আকাঙ্ক্ষা মেটাচ্ছে। আশ্রমঘরে অন্য যারা শুয়েছিল তারাও বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাঘ চলে যাবার উপক্রম করছে। কিন্তু ভজলেরামের আকাঙ্ক্ষা আর মিটছে না।

—গোঁসাই, বাঘকে আর কিছুক্ষণ রাখুন। ভাল করে দেখে নিই।

ভজলেরামের আকাঙ্ক্ষা মিটলে তবে বাঘ স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

আশ্রমের কাছে এক টুকরো জমি চাষ করে তাতে ধান বোনা হয়েছে। চারা পরিণত হয়ে এখন ধান এসেছে। শুরু হল শূয়োরের অত্যাচার। কোথা থেকে একদল শূয়োর চুপি চুপি এসে ধান ক্ষেতের ভেতর ঢুকে সব নষ্ট করে দেয়। আশ্রম রক্ষীরা টের পেয়ে লাঠি নিয়ে ছুটে যায় কিন্তু একদিনও একটি শূয়োর ধরতে পারে না। ক্ষোভে, দুঃখে, বিরক্তিতে মন ভরে

ওঠে। বিস্মিতও হয় কম নয়। কি করে যে শূয়োরগুলো তাদের আগমনের খবর পায় এটা তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পাচ্ছে না! বহু সতর্কতা অবলম্বন. গোপনভাবে অবস্থান করেও ফল হয়েছে একই। আর একদিন যখন রক্ষীরা টের পেয়েছে বরাহদের আগমন, তারা সন্তর্পণে ছুটল চারিদিক থেকে ঘেরাও করার জন্য। কিন্তু বাবার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনছে গোঁসাই-এর মৃদু কণ্ঠস্বর। যেন চুপি চুপি কাউকে কি বলছেন। কিন্তু ঘরে ত কেউ নেই। তাই একজন বেড়ার গায়ে কান পেতে রইল।

—ওরে শিগগির পালা, শিগগির পালা। তোদের মারতে আসছে।

এতদিনে তারা বুঝল কেন তাদের সবরকম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই বাবা লোকনাথের অলৌকিক কাহিনী —তাঁর জীবে দয়া, পীড়িতের মর্মবেদনায় কাতরতা প্রভৃতি নানা কথা। ঈশ্বর ঘোষও গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। ভক্তিতে বিস্ময়ে ভরে উঠছে তাঁর মন। সহসা তাঁর মনে হল—তাঁরা এতগুলো লোক আশ্রমে খেয়েছেন এজন্য ব্রহ্মচারীকে কিছু দেওয়া উচিত। সামাজিক নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণের বাড়িতে খেলে ব্রাহ্মণেতর জাতিদের প্রণামী স্বরূপ কিছু দিতে হয়। তাই গোটা পাঁচেক টাকা প্রণামী বাবদ লোকনাথকে দেবেন মনে করে রায় বাহাদুর স্থানত্যাগ করে উঠে ব্রহ্মচারীর ঘরের দিকে রওনা হলেন।

লোকনাথ তখন বসেছিলেন ঘরের ভেতরে। রায় বাহাদুরকে আসতে দেখে ভেতরে আহ্বান জানালেন। আদেশ মত ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ করতেই লোকনাথ বললেন:

—উকিলবাবু! তোমরা অনুগ্রহ করে এখানে এসে যে খাওয়া দাওয়া ও আমোদ প্রমোদ কর, সে-সবই তোমাদের জিনিষ দিয়েই হয়ে থাকে; এর কিছুই আমার নয়। এমন কাজ কর না বা এমনভাব দেখিও না যাতে কেনা-বেচা হয়।

ঈশ্বর ঘোষ এতক্ষণ লোকমুখেই শুনেছিলেন তাঁর অন্তর্যামিত্বের কথা কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাঁর বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা নেই। যে-কথা তাঁর অন্তর্যামী ভিন্ন আর কারো ঘুণাক্ষরে জানবার কথা নয়, সে-কথা ইনি এখানে বসে জানলেন কি করে?

বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। রাত্রে চলে আসার অনুমতি চাইলে লোকনাথ বললেন:

—মেঘনা নদীর ঘাটে তোমাদের নৌকো। এখান থেকে পনের মিনিটের বেশি ব্যবধান নয়, তবু সঙ্গে একজন লোক দি। হয়ত তোমরা পথ ভুলে যেতে পার।

আপত্তি জানিয়ে রায় বাহাদুর বললেন:

—আমরা ন' দশজন লোক, তা ছাড়া সঙ্গে দুটো হ্যারিকেন। এই ত সামান্য পথ। সামনে ছোট একটা মাঠ তারপরই নদীর ঘাট। আমাদের জন্য আপনার চিন্তা করতে হবে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের চিন্তা তাঁকে করতে হয়েছে। সেই দলটি অনেক দুঃখ-কষ্ট, অনেক দুর্ভোগের পর প্রায় সারারাত ধরে এ-পথ সে-পথ এ-মাঠ সে-মাঠ ঘুরে কোথায় কোন্ দূর গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হন। তারপর গ্রামের লোকদের সাহায্যে কোনক্রমে অবসন্ন দেহ নিয়ে নৌকায় ফিরে যান। পরদিন মুখ চুন করে আশ্রমে উপস্থিত হলে লোকনাথ হেসে বললেন:

—কেমন উকিলবাবু! তোমরা না বলেছিলে তোমাদের জন্য আমার কোন চিন্তা করতে হবে না? কাল তিনবার তোমাদের বললাম, সঙ্গে লোক দিই। তিনবারই তোমরা উপেক্ষা করলে। কাল কোথায় গিয়েছিলে? বাঘাই জঙ্গলের ধারে গিয়ে পড়েছিলে। আমি তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম তাই কোন বিপদ ঘটতে দিইনি।

মহাপুরুষের কথা অবহেলা করার অনুতাপে তাঁদের মুখ কাল

হয়ে উঠল। কিন্তু সেই সঙ্গে লোকনাথের অমানুষিক শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে তাঁরা হর্ষ ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ভয়ে ভক্তিতে যুগপৎ নত হয়ে এল সবার মাথা। লোকনাথের পায়ের উপর তাঁরা লুটিয়ে পড়লেন।

রায় বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাপুরুষের উপদেশপ্রার্থী। বললেন :

—বাবা! আমাদের গুরুকুলে পুরুষদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাঁর কাছে আমি মন্ত্র নিতে পারি বা তত্ত্বোপদেশ পেতে পারি। তাই আপনার কাছে কিছু ধর্মোপদেশ চাই। আপনি অনুগ্রহ করুন।

লোকনাথ বললেন :

—সাংসারিক লোকেদের না হওয়ার কারণ কি যদি আয় ব্যয় বিচার করে চলে।

ঈশ্বরচন্দ্র কথাটা বুঝতে পারলেন না। বললেন :

—কি বললেন বুঝতে পারলুম না।

—তুমি উকিল হয়েও কেন এত বোকা হলে ?

রায় বাহাদুর লজ্জিত হলেন।

—বাবা! বুঝিয়ে দিন।

ব্রহ্মচারী বললেন :

—তোমরা সৎ ও অসৎ দু-রকম কাজই করে থাক। রাতে শোবার সময় চিন্তা করবে আজ কতটা সৎ ও কতটা অসৎ কাজ করেছ। সৎ কাজগুলো জমা আর অসৎ কাজগুলো খরচ। অসৎ কর্মের ভাগ বেশি হলে খরচ বেশি হল আর সৎ কর্মের ভাগ বেশি হলে জমার দিকে বেশি হল। এভাবে ছ'মাস কর্মের হিসেব নিকেশ করলে দেখবে অসৎ কর্মের সংখ্যা কমে গেছে, সৎকর্মের সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। ছ'মাস পরে দেখবে বহু কষ্ট বহু সাধনা করে

যোগী সন্ন্যাসী যা লাভ করতে পারে তুমি অল্পদিনে অল্পায়াসেই সে অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছ। এই তোমার প্রতি আমার উপদেশ। এই উপদেশ মত চলতে থাক। একমাস পরে আমার কাছে আবার এস।

ব্রহ্মচারীর এই উপদেশ নিয়ে রায় বাহাদুর ঢাকা চলে গেলেন। কিন্তু এই উপদেশেও তার মনের আকাঙ্ক্ষা মিটল না। তিনি লোকনাথের কাছে মন্ত্র নেওয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ চিঠি দিতে লাগলেন। দেহত্যাগের অল্প কিছুদিন আগে ব্রহ্মচারী বাবা তাঁকে তিনটি মাত্র শব্দ বলে পাঠিয়ে দিলেন।

'মন্ত্রণা মন্ত্র না'।

কুমিল্লা খুনের মোকদ্দমার (shooting case) আসামী নিবারণ রায়। ঢাকার শ্রেষ্ঠ উকিল আনন্দ রায়ের আপ্রাণ চেষ্টায়ও আসামীকে খালাস করা গেল না। বিচারে ফাঁসির হুকুম হল। আসামী পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আপীল করা হল। আজ আপীলের শুনানী। নিবারণ জেলের কুঠরীতে আবদ্ধ। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আশা-হতাশায় তার মন অশান্ত। প্রতি মুহূর্তে সে শুনছে মৃত্যুর পদধ্বনি—কদর্য তার রূপ নিয়ে দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠছে তার দেহ, চোখের সামনে নেমে আসছে একটা কালো পর্দা। জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিভে যায় এক ফুৎকারে, সমস্ত চেতনা হয় স্তব্ধ আবার পর মুহূর্তেই জ্বলে ওঠে আশার আলো, ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নে ভরে ওঠে মন। আশা আকাঙ্ক্ষার কত ছবি সে আঁকে মনে মনে, কিন্তু স্বপ্নের এই মোহ বেশিক্ষণ থাকে না। কেননা স্বপ্ন সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই সে দেখছে না।

লোকমুখে শুনেছে বারদীর ব্রহ্মচারীর কথা—তার অলৌকিক

শক্তি, করুণার কত কাহিনী! শুনেছে আকুল হয়ে ডাকলে দেবতা অনুগ্রহ করেন। দেবতা বিপদভঞ্জন পতিতপাবন। সকল আশা ভরসা ত শেষ হয়ে গেছে। একবার লোকনাথকে ডেকে শেষ চেষ্টা করার অধীরতা জাগল তার হৃদয়ে। বিপদেই মানুষের বিশ্বাস অবিশ্বাসের চরম পরীক্ষা।

আজ আপীলের শুনানীর দিন। উন্মত্তের মত নিবারণ রায় জেল কুঠরীর ভেতর পায়চারী করছে। মুখে শুধু 'বাবা লোকনাথ রক্ষা কর'। দৃষ্টি তার উদ্‌ভ্রান্ত। মনে নেই কোন আশাভরসা। ভয়ও নেই ভাবনাও নেই। বিকলতা সমস্ত মনে, অবসাদগ্রস্ত সমস্ত দেহ। সহসা দেখল অপূর্ব এক মূর্তি তার সামনে উপস্থিত। জটাজুটধারী কৌপীন পরিহিত অর্ধ উলঙ্গ এক সাধু। কি আশ্চর্য! এত প্রহরী এড়িয়ে কঠিন লৌহ শিকে সুরক্ষিত বদ্ধ দরজার ভেতর দিয়ে কি করে ঢুকল এই সাধু? নিবারণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। ভীতত্রস্তভাবে ভগ্নস্বরে প্রশ্ন করলেন, — আপনি কে?

—আমি তোর রায় লিখে দিয়ে এসেছি। তুই খালাস হয়েছিস।

আশ্চর্য্য! বলে কি লোকটা? এও কি সম্ভব! কোথায় কলকাতা হাইকোর্ট, কোথায় ঢাকার এই জেলখানা! আর কেই বা এই লেংটিপরা সন্ন্যাসী হাইকোর্টের জজকে দিয়ে লিখিয়েছে খালাসের হুকুম? না, সত্যি তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পাগলের মত চীৎকার করে উঠলেন নিবারণ, —কে তুমি?

—আমায় চিনলি না? আমি বারদীর ব্রহ্মচারী।

বারদীর ব্রহ্মচারী! বাবা লোকনাথ! কিন্তু কোথায়? কই, কেউ ত নেই। মিথ্যা, সব ফাঁকি, চোখের ভুল। হাঃ হাঃ হাঃ, ফাঁসির হুকুম—খালাস।

পায়ের তলা থেকে সরে গেল সমস্ত অবলম্বন। চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলেন নিবারণ। জ্ঞান ফিরে এলে শুনলেন তাঁর

মুক্তির সংবাদ। সত্যি তিনি খালাস পেয়েছেন। ফাঁসির হুকুম হয়েছে রদ।

এমনি ঘটনা ঘটেছিল ডাঃ নিশি বসু, বি. এস্-সি. এম.-ডি মহাশয়ের চাকুরী জীবনে। ডাঃ লিণ্ডলার্স স্বাস্থ্যাগারের প্রাকৃতিক চিকিৎসা কেন্দ্রের (Dr. Lindlaler's Sanatorium for Nature Cure and Osteopathy) ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার নিশিবাবু। একদিন আমেরিকাবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা শূলরোগে আক্রান্ত হয়ে ডাঃ বসুর কাছে আবেদন জানালেন তাঁকে ভারতীয় মতে চিকিৎসা করার জন্য। কিন্তু ডাক্তার বসু দেখলেন যে, তাঁর অবিলম্বে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। সুতরাং তাকে জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল অস্ত্রোপচারের জন্য। কিছুদিন পর নিশিবাবু তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন। ডাক্তার বসুকে দেখে মহিলা প্রথম সম্ভাষণেই নিশিবাবুকে বললেন—"Doctor, I have got my medicine. An Indian Yogi gave me in my dream। কথা কটি বলে মহিলা তাঁর বালিশের তলা থেকে এক টুকরো শেকড় বের করে দেখালেন। রোগিনীর বিছানার ধারে এক চেয়ারে বসে তিনি কথাবার্তা বলছেন। হঠাৎ রোগিনী বলে উঠলেন: Look, Look Doctor behind you. That's the Indian Yogi I saw in my dream last night. He gave me the medicine. Perhaps he is your spiritual guide. (ডাক্তার, তোমার পেছনে উনি কে? গতরাতে স্বপ্নে আমি এই ভারতীয় যোগীকে দেখেছিলাম। ইনিই আমায় ওষুধটি দিয়েছেন। সম্ভবতঃ উনি তোমার ধর্মগুরু)। পিছন ফিরে নিশিবাবু অবশ্য কিছু দেখতে পাননি। তবে মহিলা উল্লিখিত যোগীর যে রূপ বর্ণনা দিলেন তা হুবহু লোকনাথের চেহারার সঙ্গে মিলে যায়। সন্দেহ-দোলায়িত মনে ডাঃ বসু

বারদীতে তাঁর আত্মীয়কে cable করে লোকনাথের একটা ফোটো পাঠাতে অনুরোধ করলেন। যথাসময়ে ফোটো এলে মহিলাকে দেখাতে তিনি স্বীকার করলেন এঁকেই তিনি দেখেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন থেকে মহিলার রোগ আরোগ্য হয়ে যায়, অস্ত্রোপচার করার আর প্রয়োজন হয়নি।

কেদারেশ্বর সেন, বি-এ, ক্লাশের ছাত্র। কলকাতায় থেকে পড়ছেন। তাঁর গুরুদেব রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় (বাবার প্রিয়তম শিষ্য) লোকনাথের একখানা পুরনো ছবি পাঠিয়ে দিলেন বৃহদাকারে অয়েল পেন্টিং করে দেওয়ার জন্য। কেদারবাবু সেটি বিখ্যাত এক শিল্পীর কাছে দেন। ফোটোখানা পুরনো বলে দু'এক জায়গায় বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় শিল্পীর কাজ করার পক্ষে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই তিনি একখানা ভাল ফোটো সংগ্রহ করার জন্য বললেন। কিন্তু কেদারবাবু ঢাকাতে চিঠি লিখেও ভাল ফোটো সংগ্রহ করতে পারেন না। আবার শিল্পীর কাছে যাওয়ার নির্ধারিত দিনে কেদারবাবু উপস্থিত হলে শিল্পী খুব খুশি মনে বললেন :

আর কিছুক্ষণ আগে কেন এলেন না? তাহলে স্বচক্ষে দেখতে পেতেন। একজন ব্রহ্মচারী নিজে এসে দাঁড়িয়ে থেকে ফোটোর কোথায় কি ত্রুটি দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর উপদেশ মত আমি ছবি এঁকেছি। বিস্মিত কেদারবাবু প্রশ্ন করলেন—কে সে সাধু? কোথায় তিনি? শিল্পী বললেন—আমি তাঁকে বসতে বলে তাঁর জন্য আহারের বন্দোবস্ত করতে বাড়ির ভেতর গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি তিনি নেই।

কয়েকজন শিক্ষিত ভদ্রলোক ঢাকা থেকে এসেছেন ব্রহ্মচারীর আশ্রমে। দেখাশোনা হয়ে গেলে রোদের তাপের জন্য প্রত্যা-বর্তনে ইতস্ততঃ করতে থাকায় ব্রহ্মচারী তাঁদের অসুবিধার কারণ বুঝলেন। তিনি তাঁদের ডেকে বললেন :

—চলে যাও, সূর্যের তাপ ভোগ করতে হবে না।

ব্রহ্মচারীর কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে না পারলেও তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারলেন না। তাঁরা রওনা হলেন। কিছুদূর যেতে তাঁরা দেখেন একখণ্ড মেঘ সহসা সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে। একে ব্রহ্মচারীর আদেশ মনে করে তাঁরা এলেন পুনরায় আশ্রমে। লোকনাথকে বললেন :

—প্রভু, আপনার আদেশমত মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে। কিন্তু সংশয়ী মন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছে না। আপনি বলে দিন, আমরা কোথায় পৌঁছলে সূর্য মেঘমুক্ত হবে ?

মৃদু হাসি দেখা দিল ব্রহ্মচারীর মুখে। ওদের সংশয়ে বিরক্ত হননি, হয়েছে কৌতূহল। বললেন :

—ঢাকা শহরে ঢুকতেই দয়াগঞ্জে পৌঁছলে মেঘ সরে যাবে, প্রকাশ পাবে সূর্যের কিরণ।

বারদী থেকে ঢাকা প্রায় সতের আঠার মাইল রাস্তা। সম্পূর্ণ রাস্তাটা মেঘ ব্রহ্মচারীর আদেশ অমান্য করেনি। আশ্রিতদের করেছে ছায়া-শীতল। ভক্তদের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই। তাঁরা আর ঘরে ফিরে গেলেন না, ভক্তি গদগদ হয়ে পুনরায় হেঁটে পৌঁছলেন বারদী—ব্রহ্মচারীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেন। জানালেন তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা।

পুলিশ সাব ইনস্পেক্টার গৌরগোপাল রায়। বর্ধমান জেলায় বাড়ি। ভোলাগিরির শিষ্য, নাম শুনে এসেছেন বারদী, ব্রহ্মচারীকে দেখতে। ব্রহ্মচারীর ঘরে ব্রহ্মচারীর সামনেই বসে আছেন। একটি মহিলা নিয়ে এলেন এক বাটি সরসহ ঘন দুধ লোকনাথের পানের জন্য। দুধ রেখে মহিলা চলে গেলে ব্রহ্মচারী ডাকলেন।

—আয়, আয়।

লোকনাথ ও গৌরগোপাল ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। কিন্তু লোকনাথের ডাক শুনে ঘরে আর একজন প্রবেশ করল ধীর মন্থর গতিতে। জাতিতে সে তির্যগ বর্ণে কেউটে। অত বড় একটা বিষাক্ত সাপকে ঘরে ঢুকতে দেখে গৌরগোপালের দেহের সমস্ত রোম খাড়া হয়ে উঠল। কিন্তু একজন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আছেন, অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নেই এই মনে করে চুপ করে বসে রইলেন।

হাত বাড়িয়ে লোকনাথ সাপের ফণাটি ধরে দুধের বাটির ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। সমস্ত দুধ পান করা হয়ে গেলে সাপটির ফণা তুলে নিয়ে লোকনাথ বললেন :

—এবার নিজের জায়গায় চলে যাও।

সুবোধ বালকের মত কেউটে মহাপুরুষের আদেশ মান্য করল। মুহূর্তে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ব্রহ্মচারী দুধের বাটি থেকে কিঞ্চিৎ সর তুলে নিয়ে নিজে মুখে দিয়ে গৌরগোপালকে বাকিটা দিয়ে বললেন, —প্রসাদ নে।

প্রসাদ! বিষাক্ত সাপের জিহ্বা স্পৃষ্ট দুধের সরের এই প্রসাদ খেয়ে বেঁচে থাকা যাবে কি?

—নে না, কোন ভয় নেই।

অভয় আদেশ। এবার আর দ্বিরুক্তি নেই। হাত পেতে পরম শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করলেন মহাপুরুষের প্রসাদ।

মাণিকগঞ্জের এক মুসলমান জমিদার। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর কন্যাটি জন্মান্ধ। মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তির কথা তিনি শুনেছেন—শুনেছেন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তার করুণা বিতরণের কথা। মহাবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় সকলেরই সমান অধিকার। ছোট বড় ধনী দরিদ্রের কোন বিচার নেই।

ব্রহ্মচারী বাবার স্বহস্ত-লিখিত পত্র

(ডাঃ নিশিকান্ত বসু মহাশয়ের সৌজন্যে)

ব্রহ্মচারী বাবার স্বহস্ত-লিখিত পত্র

(ডাঃ নিশিকান্ত বসুর সৌজন্যে)

প্রকাণ্ড এক বজরা করে সকন্যা এলেন বারদী। মহাপুরুষের পায়ের তলায় কন্যাকে রেখে বললেন :

—বাবা দয়া কর। তুমি বোবার মুখে ফুটাও বাণী, খঞ্জের পায়ে দাও পাহাড় ডিঙানোর সামর্থ্য, অন্ধরে দাও দৃষ্টি। জন্মান্ধ এই অভাগিনী, তোমার করুণাময় হাতের স্পর্শে দূর করে দাও এর অন্ধকারের যবনিকা, স্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠুক তোমার অভয়-পদ, অশেষ ঐশ্বর্যময়ী এই পৃথিবীর শ্যামল রূপ।

ভক্তের কাতর প্রার্থনায় মহাপুরুষের করুণাঘন রূপ ফুটে উঠল। হাত দিয়ে বালিকার চোখে-মুখে করলেন স্নেহের স্পর্শ। জমিদার বুঝলেন, বাবা দয়া করেছেন। কন্যাকে নিয়ে চলে গেলেন বজরায়।

পরদিন সকাল বেলা জমিদার সাহেব তৈরি হচ্ছেন আশ্রমে যাবার জন্য। মেয়ে ডেকে বলল।

আব্বাজান, দেখ কী সুন্দর! দূরে ঐ বেলগাছ, ঐ বাবার আশ্রম।

বিস্ময়ে আনন্দে জমিদার অভিভূত হয়ে পড়লেন। মেয়ে তাঁর দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। তাকে বুকে নিয়ে ছুটলেন আশ্রমের দিকে। উপস্থিত হলেন আশ্রমে দেবতার সন্নিকটে। লুটিয়ে পড়ে ধুয়ে দিলেন বাবার পাদপদ্ম কৃতজ্ঞতা-ভক্তি-বিস্ময়ের অশ্রুতে।

বারদীর জমিদার রাজমোহনবাবুর ছেলে উমাপ্রসন্ন নাগের স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে কয়েক মাস পরে সুতিকারোগে মারা গেলেন। শিশু সন্তানের জীবনধারণে ঘটল অন্তরায় মাতৃস্তন্যের অভাবে। আত্মীয়াদের ভেতর দুগ্ধবতী অন্য কাউকে পেলেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর একটি মুসলমান স্ত্রীলোক পাওয়া গেল। কিন্তু ছেলেটির পেটে সে দুধ সইছে না। উদরাময় দেখা দিয়েছে। ছেলেকে বাঁচান অসম্ভব হয়ে উঠল। বাবার কাছে নিবেদন

করলেন ছেলেটির প্রাণ সংশয়ের কথা উমাপ্রসন্নের ভগিনী সিন্ধু-বাসিনী। বাবা সব শুনে বললেন, তুমি ছেলেকে স্তন দাও।

সেকি কথা! সিন্ধুবাসিনী যে বন্ধ্যা!

একি বাবার রহস্য! অন্তর্যামী সব জেনেও এ আদেশ কেন করছেন?

অন্তরায় দূর হল। বাবা প্রসন্ন হয়েছেন। নয়নে বিচ্ছুরিত হচ্ছে করুণার আভা, মুখে ফুটে উঠেছে শিশুর সরলতা।

—আয় ত মা এদিকে। এগিয়ে বস আমার কাছে। অনেক দিন মায়ের দুধ খাইনে কিনা, তাই আজ বড় সাধ হয়েছে দুধ খাব।

অসম্ভব হল সম্ভব, অঘটন ঘটে গেল। ব্রহ্মচারীর মুখস্পর্শে সিন্ধুবাসিনীর স্তনযুগলে নেমে এল ক্ষীরের ধারা। ভ্রাতুষ্পুত্রকে বুকে তুলে নিয়ে সিন্ধু মুখে স্তন তুলে দিলেন। ব্রহ্মচারীর দয়ায় ছেলে প্রাণ পেয়েছে, তাই তার নাম রাখা হল '**ব্রহ্মপ্রসন্ন**'।

ঢাকা কলেজের কয়েকটি ছেলে এসেছে ব্রহ্মচারীর কাছে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হয়ে। ছেলেরা প্রশ্ন করল, কণ্ঠে সন্দেহের সুর।

—আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?

—না। আমি শতাধিক বৎসর পাহাড় পর্বত ভ্রমণ করেছি—এ শরীরের উপর অনেক বরফ জল হয়ে গেছে, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। আমি দেখেছি আমাকে, আমি বদ্ধ আছি সংসারে (দেহে), সংসার বদ্ধ আছে কর্মে, কর্মের মধ্যে আহার ও বিহারই প্রধান। আধার বুঝে জ্ঞান। লোকনাথ বললেন,—অখণ্ডমণ্ডলাকারং শ্লোকটি জানত? যা অখণ্ডমণ্ডলাকার, যার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এই চরাচর এহেন ব্রহ্মকে যিনি দেখিয়ে দেন সেই গুরুকে নমস্কার করি।

ছেলেরা বলল, —আপনাকেই আমরা গুরু করব।

—সে হবে। শ্লোকটির অর্থ বুঝেছ?—লোকনাথ প্রশ্ন করলেন;

—আপনি বুঝিয়ে দিন।

তোমাদের পক্ষে ব্রহ্ম কি?—টাকা। টাকার রূপ অখণ্ড মণ্ডলাকার। চরাচর জগতে টাকার প্রভুত্ব চলেছে। সেই টাকা ব্রহ্মের দর্শনের জন্য তোমরা দীক্ষিত হয়েছ। অধ্যাপক নামক তোমাদের গুরু সেই টাকা ব্রহ্মলাভ করার পথ দেখিয়ে দেবেন। কাজেই এখন সেই গুরুর অনুসরণ কর। পরে যদি টাকা ব্রহ্মলাভ করে তাকে ছেড়ে আসার সুযোগ হয় তখন এস, দেব সময়োপযোগী উপদেশ। উপযুক্ত শিক্ষার্থীর জন্য উপযুক্ত উপদেশ। ছেলেরা উপলব্ধি করল শ্লোকের সারবত্তা—লোকনাথের উপদেশের অন্তর্নিহিত মর্ম।

লোকনাথের মহিমা-গানে আজ বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত। গ্রাম থেকে গ্রামে, নগর থেকে নগরান্তরে, ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের কুটিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে লোকনাথের জয়গান: জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে হচ্ছে তাঁর ভক্ত। দূর দেশান্তর থেকে ছুটে আসছে আর্ত পীড়িত নরনারী। দেবতার অকৃপণ হাতের দান করুণা লাভ করে হচ্ছে ধন্য।

ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ। পূর্ববঙ্গে বিখ্যাত এই রাজপরিবার। মানে, মর্যাদায়, অর্থসম্পদে এঁদের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। এ হেন বংশের উত্তরাধিকারী রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মনে জাগল মহাপুরুষকে দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং আয়োজন শুরু হল। রাজরাজরার নড়াচড়া ত সহজ ব্যাপার নয়। রাজা রওনা হলেন হাতির উপর সওয়ার হয়ে পারিষদ সঙ্গে নিয়ে। পথে আসতে পারিষদদের সঙ্গে চলল আলোচনা সাধুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা হবে কিনা? রাজেন্দ্রনারায়ণ নিজে ব্রাহ্মণ, তায় ভাওয়ালের

রাজা, গণমান্য ব্যক্তি। তাঁর কি সাজে অজ্ঞাতকুলশীল কারো পায়ের উপর লুটিয়ে পড়া—তা সে যত বড় সাধুই হোক না কেন? সুতরাং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম না করার সিদ্ধান্ত হল।

সপারিষদ রাজেন্দ্রনারায়ণ উপস্থিত হলেন বারদী গ্রামে, লোকনাথের আশ্রমে, ব্রহ্মচারীর পর্ণকুটিরে। এতবড় একজন সম্মানিত ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত আগমনে বারদীবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, আশ্রমের চারদিকে কৌতূহলী জন-সমাগম। গ্রাম-বাসীরা দূর থেকে সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবধান রক্ষা করে দেখছে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণকে। মহিমান্বিত ভাওয়ালের রাজা। হাতি থেকে মহারাজ নেমে এলেন, আশ্রমের পর্ণকুটিরে ঢুকে দেখেন জীবন্ত এক শিবমূর্তি আসনে উপবিষ্ট। পলকহীন চোখ দুটির দিকে চেয়ে মহারাজের কি হল কে জানে, লুটিয়ে পড়লেন ব্রহ্মচারীর পায়—সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। ঐশ্বর্যের অভিমান গেল ভেঙে, রাজমুকুট ধন্য হল লেংটা সাধুর পাদস্পর্শে—জগতে আর একবার প্রচার হল রিক্তের গৌরব, মহাপুরুষের মাহাত্ম্য।

—কেন বাবা, প্রণাম করবে না বলেই ত মনে মনে স্থির করেছিলে?

রাজেন্দ্র বিস্মিত, ভীত, লজ্জিত। মনের কথা এমনি করে যিনি জানতে পারেন তিনি ত অন্তর্যামী! তাঁর কাছে ত গোপন করার, অস্বীকার করার কিছু নেই! তাই মহারাজ দিলেন মনের কবাট খুলে। সেদিন থেকে তাঁর আর রইল না কোন গোপনতা—কি অন্তর, কি বাহির, কি ঐহিক, কি পারলৌকিক!

ভাওয়ালের পিতৃপিতামহের শ্মশানকে বলা হয় শ্মশানেশ্বর। প্রত্যেকের শ্মশানের উপর একটি করে মঠ এবং তাতে প্রতিষ্ঠা করা আছে শিবলিঙ্গ। অধুনা শ্মশানে রাজেন্দ্রনারায়ণ নতুন এক মন্দির তৈরি করিয়েছেন। ইচ্ছা ব্রহ্মচারীকে এনে সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করবেন—জীবন্ত শিবের মূর্তি। রাজা জানালেন তাঁর

আবেদন, কিন্তু মহাপুরুষ রাজী হলেন না। বারদী ছেড়ে কি তিনি কোথাও যেতে পারেন? বললেন, —আমি ত সর্বত্রই আছি রে।

ব্রহ্মচারী বারদী ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক। রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধ ও কাতর আবেদনেও লোকনাথ স্থান ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। অনন্যোপায় রাজা লোকনাথের একখানা ফোটো তুলে নিতে চাইলেন।

প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা। লোকনাথ মহাযোগী, সিদ্ধ মহাপুরুষ। জীবনে ঐহিক প্রতিষ্ঠা তাঁর কাম্য নয়, শূকরী বিষ্ঠাতুল্য পরিত্যাজ্য। তাই তিনি আপত্তি জানালেন।

—এই দেহ ত অনিত্য, এর আবার চিত্র রেখে কি হবে রে? যা যা আমি ছবি তোলাব না।

রাজাবাহাদুর বললেন, —এতদূর থেকে এত কষ্ট করে যন্ত্রাদি নিয়ে এসেছি, মনে ছিল আশা তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করব. সে সাধ ত পূর্ণ হল না। অন্ততঃ তোমার একখানা ছবি তুলে কাছে রাখতে পারি তার অনুমতি দাও, প্রভু।

ব্রহ্মচারী বললেন, —ফোটো নিয়ে কার কি উপকার হবে?

-হবে না! রাজার কণ্ঠে ফুটে ওঠে নিশ্চয়তা। বললেন, তোমার মত মহাপুরুষের ছবি যার ঘরে থাকবে তার ঘর হবে পবিত্র—গৃহস্বামীর হবে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল। তা ছাড়া, এই ফোটো বিক্রি করে একজন গরীব লোকের জীবিকা চলতে পারবে।

বুদ্ধিমান রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ। তিনি ব্রহ্মচারীর ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছেন। মানুষের উপকারের জন্য, গরীবের দুঃখ নিবারণের জন্য, ব্রহ্মচারীর হৃদয় সর্বদা ব্যাকুল। তিনি আর আপত্তি করলেন না। বললেন:

—আমার ছবি নিয়ে যদি মানুষের কোন উপকার হয় তাহলে আমার আপত্তি নেই। ছবি তুলে নাও, আমি প্রস্তুত।

রাজার আনন্দ আর ধরে না। ছবিতে ধরে নিলেন ব্রহ্মচারীর করুণাময় রূপ— মানবের হিতের জন্য, জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়।

জগন্নাথ কলেজের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অনাথবন্ধু মৌলিক ও পুলিশ-ইনস্পেক্টার কালীকান্ত নন্দী একত্রে বারদী এসেছেন। দেখছেন শুনছেন—দুর্বুদ্ধি হল ব্রহ্মচারী বাবাকে পরীক্ষা করতে হবে। এমন অসময়ে, দেখি বাবা একটি পাকা কাঁঠাল খাওয়াতে পারেন কিনা। দু ঘণ্টা পরে একটি লোক মাথায় করে নিয়ে এসেছে বৃহৎ এক পাকা কাঁঠাল। লোকনাথ গোয়ালিনী মাকে ডেকে অনাথবাবুকে দেখিয়ে বললেন—কাঁঠালটা ভেঙে এই ছেলেটি যতটা পারে খেতে দেবে, বাকীটা অন্যদের দেবে।

অনাথবন্ধুর মনের কথা অন্য কেউ জানে না, কিন্তু অন্তর্যামী লোকনাথের অগোচর ছিল না। তাই তিনি অনাথবন্ধুকেই খেতে দিলেন প্রথম এবং যথেচ্ছ পরিমাণে। ভক্তদের প্রতি তাঁর অসীম করুণা, তাই তিনি তাদের মনে সন্দেহের সামান্য ছায়া দেখলেও বিরক্ত হতেন না। প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিয়ে তাদের সন্দেহের নিরসন করতেন। বলতেন :

—আমি শতাধিক বৎসর পাহাড়-পর্বত ঘুরে বড় একটা ধন কামাই করেছি, তোদের ঘুরতে হবে না, তোরা বসে খাবি।

ভক্তদের জন্য, শিষ্যদের জন্য, দুঃখ-পীড়িত মানুষের জন্য নিজের জীবনব্যাপী সাধনা করে যে অমূল্য ধন তিনি কামাই করেছেন, তাই বিলতে এসেছেন বারদীর পুণ্যভূমিতে। ওরে আয়, ছুটে আয়, কে কোথায় আছিস, আর্ত-পীড়িত নরনারী, পাপীতাপী অভাজন। দয়াল ঠাকুর যেচে কৃপা বিলবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন তোদেরই প্রতীক্ষায়—এ শুভ লগ্ন কি হেলায় হারাতে আছে!

আজ ১২৯৭ সাল ১৯শে জ্যৈষ্ঠ।

ভক্ত শিষ্যেরা বসে আছেন ব্রহ্মচারী বাবাকে বেষ্টন করে। আলোচনা হচ্ছে শাস্ত্রের নানা কথা। আটদিন আগে একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি ভক্তদের কাছে—দেহ পতনের পর কিরূপ সৎকার মানুষের হওয়া কর্তব্য। প্রত্যুত্তরে নানাজনে নানা মত প্রকাশ করেছিলেন। কেউ বলেছিলেন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেহ ছাই করে ফেলা কর্তব্য; যে দেহ নিয়ে মানুষের এত ভাবনা চিন্তা, এত যত্ন, এত সেবা, তার পরিণতি দেখে মানুষ বুঝুক এর নিরর্থকতা। যার পরিণতি শুধু একমুষ্টি ছাই-এ তার জন্য কেন এত দুর্ভাবনা, কেন এত মায়া!

আর একজনের মত—পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে জীবের মঙ্গলের জন্য যদি কিছু না করা গেল তবে ত মনুষ্য জন্ম বৃথা। জীবিত থাকতে যেমন জীবের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করা উচিত, জীবনান্তেও এই দেহ দিয়ে করতে হবে জীবজন্তু কীটপতঙ্গের মঙ্গল বিধান। মাটির দেহ মাটিতে দিতে হবে মিশিয়ে। দেহ থেকে কীট-পতঙ্গ তাদের আহার সংগ্রহ করবে, হাড় মাংস পচে গলে মাটিতে মিশে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করবে, শস্য উৎপাদনে করবে সহায়তা!

কারো মতে মৃতদেহ জলে নিক্ষেপ করা উচিত। সন্ন্যাসীদের দেহ পশু-পক্ষীদের আহারের জন্য মাঠে প্রান্তরে ফেলে দেওয়া প্রচলিত নিয়ম।

কিন্তু লোকনাথ মৃতদেহ অগ্নিদ্বারা সৎকারের পক্ষপাতী। কেননা অগ্নিতেই দেহ শীঘ্র লয়প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর যত শীঘ্র দেহ লয়প্রাপ্ত হয় ততই বিদেহী আত্মার পক্ষে মঙ্গল। না হলে দেহের আকর্ষণে তাকে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়—উর্ধ্বগতি পথে আসে বাধা। তাই তিনি নিজের সম্পর্কে অগ্নিদ্বারা দেহ সৎকারের ইচ্ছা ভক্তদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন।

গত দিনের সে আলোচনার আজও পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

তিনি জানাচ্ছেন, আর বেশিদিন দেহ ধারণ করে থাকার ইচ্ছে নেই। বলছেন ঃ

আমার দেহত্যাগ যদি উত্তরায়ণে দিবাভাগে হয় এবং সূর্য নির্মল আকাশে কিরণ দিতে থাকে, তবে বুঝবে আমি সূর্য রশ্মি অবলম্বন করে চলে গেছি, আমার আর কখনও পুনরাবর্তন হবে না।

লোকনাথের কথা বলার ভঙ্গিতে শিষ্যদের মনে জেগেছে সংশয়—প্রভুর মুখে আজ এ কথা কেন? কিন্তু সাহস করে, ভরসা করে কেউ কোন প্রশ্নও করতে পারছে না। লোকনাথ করছেন জীবনের হিসেব নিকেশ। প্রশ্ন করলেন ঃ

—বলত, কত বৎসর আমি বারদী এসেছি?

সব চাইতে পুরনো লোক যিনি তিনি হিসেব করে বলছেন প্রায় ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর। ১২৭০ কি ১২৭১ সালে তিনি বারদী এসেছেন, আজ ১২৯৭ সাল। হিসেব নির্ভুল। লোকনাথ মাথা নাড়েন, গণনার নির্ভুলতা সম্বন্ধে জানান সমর্থন। কিন্তু কেন, কেন এই হিসেব নিকেশ? যে অপরূপ ও অলৌকিক লীলা প্রকট করে জগদ্বাসীকে মুগ্ধ করেছেন, করুণা বিতরণ করে আর্ত-পীড়িতদের করেছেন দুঃখ মোচন, স্নেহ-হস্তের স্পর্শ দিয়ে শোক-তাপ-ক্লিষ্ট নরনারীর প্রাণে দিয়েছেন সান্ত্বনা—সে-সব কি বছরের পরিমাণ দিয়ে হিসেব নিকেশ করা যায়? মানুষের আশা সীমাহীন, আকাঙ্ক্ষা অনন্ত। তাঁর অপার্থিব সঙ্গ-সুখ, কথামৃত পান করার যে দাবী তা একদিন দুদিনের নয়, বছরের হিসেব দিয়ে সীমাবদ্ধও নয়। কবে হয়েছে তার আরম্ভ, কবেই বা হবে তার শেষ, এ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার প্রয়োজন তাদের কিছু নেই। এ-যেন অফুরাণ হয় যেন সুখের এ-দিনের অবসান না আসে।

—ওরে কটা বেজেছে রে?

আশ্রম পরিচালককে প্রশ্ন করেন লোকনাথ। পরিচালক বললে দশটা বেজেছে।

—দশটা বেজে গেছে ? শিগগির সকলকে খেতে দে। কত বেলা হয়ে গেল! লোকনাথ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। পরিচালক বিস্মিত হয়। ঘড়ি ধরে খাওয়ার নিয়ম গ্রামদেশে কখনো হয় না। বেশি বেলা করে খাওয়া ব্রহ্মচারী বাবা পছন্দ করেন না বটে, তবে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় খাওয়ারও কোন কঠিন নিয়ম নেই। তাই ব্রহ্মচারী বাবার এই ব্যস্ততায় পরিচালক একটু বিরক্তভাবেই বললে, বেলা বেশি হয়নি। সবে ত দশটা বেজেছে।

—তা হোক, তুমি লক্ষ্মীটির মত আমার কথা শোন। সকলকে এখুনি খেতে দাও।

পরিচারকের আপত্তি কিছু নেই, আর সবই প্রস্তুত। তাই সকলকে ডেকে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। সকলের খাওয়া শেষ হল। পরিচারকের কাছে অনুসন্ধান করে ব্রহ্মচারী জানলেন আশ্রমে কেউ আর অভুক্ত নেই। বাস্ নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি বসলেন যোগাসনে। দেখতে দেখতে দেহ হয়ে উঠল ঋজু, পলকহীন চোখ দুটি হল স্থির, নিবাত, নিষ্কম্প দীপশিখার মত দেহ। গভীর সমাধিমগ্ন লোকনাথ ব্রহ্মচারী। আহারান্তে অদূরে উপবিষ্ট ভক্ত ও শিষ্যেরা পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে দেখছেন লোকনাথের ধ্যানমগ্ন মূর্তি।

বেলা গড়িয়ে যায়। মধ্যাহ্ন সূর্য উত্তরায়ণে, নির্মল নীলাকাশ সূর্যকিরণোদ্ভাসিত—তাপ প্রখর। উপবিষ্ট ভক্তরা অত্যধিক গরমে অস্থির হয়ে উঠছেন। কিন্তু বাবার ধ্যানভঙ্গের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এত সময় ত তিনি ধ্যানমগ্ন থাকেন না ? সবার মনে জেগেছে সন্দেহ, তবে কি—? সকালবেলার সমস্ত আলোচনা জেগে উঠল মনে। সূর্যের উত্তরায়ণে গমন, সূর্য-

কিরণের প্রখরতা, নির্মল নীলাকাশ, বেলা দশটার মধ্যে সকলকে খাওয়ানোর ব্যস্ততা—সত্যি ত ! মূর্খ তারা, তাই বোঝেনি বাবার দেহত্যাগের ইঙ্গিত। ধ্যানমগ্ন যোগী বসেছেন শেষ যোগাসনে—দেহ পড়ে আছে অতীতের সাক্ষী হয়ে, ব্রহ্মচারী চলে গেছেন দূরে, এ জগতের সীমানা ছাড়িয়ে উর্ধ্বে—সূর্য রশ্মি অবলম্বন করে, ফিরে আর আসবেন না। লোকনাথ পার্থিব এই দেহত্যাগ করেছেন।

ঝড়ের বেগে খবর ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বন্যার জলের মত ছুটে আসতে লাগল নরনারী। তাদের পরম প্রিয়, পরম শ্রদ্ধেয় বারদীর গোঁসাই শ্রীশ্রীলোকনাথকে শেষ দেখা দেখার জন্য হাতে নিয়ে ধূপ-ধুনো, চন্দন কাঠ। বাবার শেষকৃত্যে সামান্য অর্ঘ্য।

আশ্রমের দক্ষিণ দিকে রচনা করা হল চিতাশয্যা। বরবপু স্থাপন করা হল চন্দন কাঠে তৈরি চিতার উপর। সহস্র সহস্র নরনারীর কণ্ঠনিঃসৃত জয়ধ্বনির সঙ্গে ঘৃত সহযোগে হল অগ্নি সংযোগ। ভক্ত ও শিষ্যেরা চিতা প্রদক্ষিণ করে গাইলেন—

জয়তু লোকনাথ জয় হে
জয় প্রাণারাম।
নিত্য নিরঞ্জন নয়নাভিরাম।
বিঘ্ন-বিপদ-ভয় দুঃখ-তিমির নাশ
ভব-ভয়-ভঞ্জন শিব সমান।
করুণা-জ্ঞান-ঘন আনন্দময়
ব্রহ্মসনাতন সৃজন-পালন লয়।
চিদানন্দময় তুমি, তুমি হে অন্তর্যামী,
পতিতপাবন শুনি তব নাম।
ব্যথিতের ব্যথাহারী তুমি পারের কাণ্ডারী ;
বিশ্বগুরু তুমি লহ গো প্রণাম।

পরিশিষ্ট

আজ বারদীর আশ্রম শুধু ছবি। আছে আশ্রম গৃহ, আর বাবার সমাধির উপর ভক্তগণ রচিত সমাধি মন্দির।

আজ আর নেই সেই লোক সমাগম, নেই বাবার কণ্ঠনিঃসৃত অমৃতময় বাণী। নেই দূর দূর দেশাগত ভক্ত ও বিদ্বৎজনের আকণ্ঠ মুখরিত বাবার জয় গান! জয় বাবা লোকনাথ।

সত্যি কি আজ তা স্তব্ধ! কোথায় সেই জনারণ্য, কোথায় সেই উৎসবমুখর বারদী গ্রাম, কোথায় সেই সহস্র কলকণ্ঠনিঃসৃত জয়ধ্বনি—জয় বাবা লোকনাথ!

না, আজও সে সমস্ত আছে। অন্ততঃ বিজ্ঞান তার সাক্ষ্য বহন করে। আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায় বাবার অমৃতময় উপদেশ বাণী, ভক্তজনের উচ্ছ্বসিত আনন্দের কলধ্বনি—যে মানে সে মানে, যে শোনে সে শোনে, যে মানে শোনে মজেরে প্রাণ। আর তা না হলে আজও বারদী তীর্থ করতে এসে বারদীর ধূলি-কণার স্পর্শে ভক্তপ্রাণ শিহরিত হয়ে উঠে কেন? কেন তার কণ্ঠ হতে ভেসে আসে কেদারারাগে আশ্রিত হয়ে অপূর্ব আলেখ্য সঙ্গীত—

জয়! লোকনাথ রূপধর
ব্রহ্ম পরাৎপর পীতবসন ধর দেহি পদম্।
জটাজুটমণ্ডিত আজানুবিলম্বিত
ভুজযুগ শোভিত দেহি পদম্।
রক্ততিলক ধর অস্তরাগ নভঃ পর
নয়ন মনোহর দেহি পদম্।
শ্মশ্রুবিমণ্ডিত মুখপদ্মশোভিত
গোমুখ আনন্দস্থিত দেহি পদম্।

কমণ্ডলুধারী দণ্ডী ব্রহ্মচারী
বন গমনকারী দেহি পদম্।
গুরুগত প্রাণ গুরু ধ্যান, গুরু জ্ঞান
'ভগবানে' সমর্পিত দেহি পদম্।
জয়, বারদী ঈশ্বর শুদ্ধ পরাৎপর
অস্মরণ শরণ দেহি পদম্।
পাপতাপহারী লোকনাথ ব্রহ্মচারী
অন্তিম শরণ দেহি পদম্।
(শোভনা সেন)

নীরব আশ্রমের পরিবেশ হয়ে ওঠে মুখরিত, সঙ্গীতের মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে ওঠে বাবার অপরূপ দেহবল্লরী। আঙ্গিনার ধূলি-কণার স্পর্শে ভক্তপ্রাণ যেন উদ্বেলিত, যেন লেখনীর মাধ্যমে জেগে ওঠে শ্রীশ্রীলোকনাথ বাবার কাছে আকুল প্রার্থনা। প্রথিত-যশা শ্রীশ্রীলোকনাথ মাহাত্ম্য রচয়িতা ভক্তপ্রবর শ্রীকেদারেশ্বর সেন শর্মার অপূর্ব লেখনী মুখে বেরিয়ে আসে প্রাণের আবেগভরা আকুতি। আলো আঁধারে ইমনের সুরে জেগে ওঠে মধুর সেই সঙ্গীত :

তোমারি করুণা, তোমারি স্নেহ
সুখে সদা পালিছে আমায়।
তবু ভ্রান্ত কেন অশান্ত পরাণ
নিরাশ পাথারে ভাসিয়া বেড়ায়।
পথ ভুলে যাই কণ্টক কাননে,
পথিকের বেশে পথে রাখ টেনে।
বিভীষিকা ছলে নিবারি গমনে
তোমারি করুণা জীবন বাঁচায়

ভয় পাই যদি সংসার অনলে
ভাবি বুঝি দূরে ছেড়ে গেছ চলে।
ক্ষণেক পরে দেখি আবার অঞ্চলে
লুকায়ে রেখেছ চরণ ছায়ায়।
অতীন্দ্রিয় তুমি তব সূক্ষ্ম গতি,
কি বুঝিব তব মহিমা বিভূতি।
অনন্ত আঁধারে অনন্ত মূরতি
অনন্ত স্বরূপে প্রকাশ ধরায়।

অপূর্ব সুরমাধুর্যে ভরে ওঠে আকাশ বাতাস, প্রাণের এই আকুতি ছড়িয়ে পরে সুদূর নীলিমায়। শুধু বারদী নয়, সমগ্র বাংলার ঘরে ঘরে ভক্ত হৃদয়ের এই প্রার্থনা। প্রাণের সমস্ত ভক্তি, আবেগউচ্ছ্বসিত সেই জয়ধ্বনি খণ্ডিত বাংলার বিভিন্ন মন্দিরে ১৯শে জ্যৈষ্ঠের পূত পবিত্র সেই দিনের স্মৃতি বহন করে সহস্রকণ্ঠে জেগে ওঠে—জয় বাবা লোকনাথ!

অশীতিপর বৃদ্ধ ডাঃ মনমোহন ভৌমিকের কম্পিত সজল কণ্ঠেও ভেসে আসে অন্তিম প্রার্থনা—"ভব ভয় ভঞ্জন, নিত্য নিরঞ্জন অন্তিম শরণ দেহি পদম্"।

"............সর্ব অঙ্গে তব শতাব্দীর শৈল তপস্যার
বিভাকীর্ণ কৃচ্ছ্ররেখা প্রকটিত। বেষ্টি আছে মহাদিব্যজ্যোতিঃ
তব কায়পরিবেশ, দেখাতে মানববিশ্বে পরব্রহ্মজ্যোতিঃ।
তপক্লিষ্ট শ্লথশ্রান্ত গাত্র তব আঁখিদ্বয় জ্ঞানে দীপ্তিমান,
সারল্যপ্রপ্লুত মুখে মহাবোধ স্নিগ্ধরূপে স্পষ্ট দৃশ্যমান;
নির্ঝরে ঝরিছে যেন দয়া-প্রীতি কৃপা-স্নেহ ক্ষেম আশীর্বাদ
ভুবনে করিতে শুদ্ধ সমুন্নত দুঃখহীন সুতৃপ্ত নিঃসাধ।"

—মনীষা দেবী (মহাবোধ)

———

প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার মতামত

যুগান্তর বলেন : যুগ-মানব লোকনাথ—শ্রীনরেশ রায়।

বহুজনের নিকট মহাপুরুষরূপে পরিগণিত ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীলোকনাথের জীবন ও সাধনার কাহিনী। ব্রহ্মচারী লোকনাথ পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদীর ব্রহ্মচারীরূপে তাহার ভক্তজনের নিকট সুপরিচিত। তাঁরই জীবনের বিচিত্র কাহিনী সহজ, সরল ভাবানুপ্রাণিত ভাষায় সরস গল্পের আকারে পরিবেশন করা হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক জড়-জগতের বাহিরে যাঁহারা আত্মিক ঐশ্বর্য ও পরিতৃপ্তির সূত্র খুঁজিয়া বেড়ান বইখানি তাঁহাদের ভাল-লাগারই কথা।

দেশ বলেন : যুগমানব লোকনাথ—শ্রীনরেশচন্দ্র রায় প্রণীত।

বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর পুণ্য জীবনকথা। লেখক সমগ্র অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়া এই লোকোত্তরচরিত্র মহাপুরুষের জীবনকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা উপন্যাসের মতই আকর্ষণীয়। ব্রহ্মচারী লোকনাথের ত্যাগ, তপস্যা, তাঁহার সর্বজনীন প্রেম এবং প্রীতির কথা পড়িতে পড়িতে মনপ্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। অধ্যাত্মানুভূতির স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকচ্ছটা চিত্তের উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে যুগপৎ উচ্চকিত এবং উন্নত করিয়া তোলে। পড়া শেষ হইলেও আবও পড়িবার ইচ্ছা জাগে। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

আনন্দবাজার বলেন : যুগমানব লোকনাথ—শ্রীনরেশ রায়।

লেখক গ্রন্থের কৈফিয়ৎ অংশে লিখেছেন, 'শৈশবে আমার মনে লোকনাথ ব্রহ্মচারী সম্পর্কে কৌতূহল যিনি প্রথম উদ্রেক করেন তিনি আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব। .... ইহা ছাড়া আমার মাতামহ ৺ভগবানচন্দ্র দাস ছিলেন একজন সাধক। শুনেছি স্বপ্নে তোতাপুরি থেকে মন্ত্র পেয়ে তিনি সাধনপথে অগ্রসর হন। সূক্ষ্মদেহে ব্রহ্মচারী লোকনাথ এসে আসন প্রাণায়ামাদির দিতেন হাতে কলমে শিক্ষা। ...ইত্যাদি ইত্যাদি।' শ্রদ্ধাবিগলিত মনে ভক্তির উচ্ছ্বাস হয়ে দেখা দিয়েছে লেখকের এই লোকনাথ জীবনী।......মনের ভক্তিভাব' যেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি হয়ে দেখা দেয় সেখানেও যে জীবনী সাহিত্যের অন্য এক রস, অন্য এক মাধুর্য দেখা দেয় তার প্রমাণ এই 'যুগমানব লোকনাথ'। দেবদ্বিজে ভক্তজনদের কাছে এ বই একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত হবে।